আকাশের আতঙ্ক

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

কমলা পাব্লিশিং হাউস
৮-১-এ, হরি পাল লেন,
কলিকাতা

উপহার

আজকালকার খবরের কাগজের দিনে আমরা নিত্যনূতন বিস্ময়কর খবর শুনতে শুনতে কি রকম মিথ্যা উত্তেজনার মধ্যে যে বাস করি, একদিন যে খবর আমাদের অবাক করে দেয়, পরের দিন আরো বিস্ময়কর ঘটনায় সে খবর কেমন অনায়াসে আমাদের মনে চাপা পড়ে যায়, তার প্রমাণের অভাব নেই।

বেশীদূর যেতে হবে না। ১৯···সালের বৈশাখ মাসের কথা। খবরের কাগজগুলো একদিন সার চিরঞ্জীব রায়ের অবিশ্বাস্য ভয়ঙ্কর খুনের মামলা নিয়ে তুমুল হৈ-চৈ বাধিয়ে

তুলেছিল। হপ্তাখানেক ধরে খবরের কাগজে আর অন্য কথাই বুঝি ছিল না। সোজা কথা ত নয়। স্বয়ং সার চিরঞ্জীবের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ! সার চিরঞ্জীব ইদানীং অবশ্য একটু যেন কেমন হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে মস্তিষ্ক বিকৃতির একটা গুজব চারিধারে শোনা যেতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু তা বলে এতটা কেউ কি কল্পনাও করতে পারে! তাঁর পূর্ব্ব কীর্ত্তির কথা তখনও ত লোকে ভোলেনি। সার উপাধির দ্বারা ত তাঁর পরিচয় নয়, তাঁর পরিচয় বাঙ্গলার গৌরব ও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ একজন বৈজ্ঞানিক হিসাবে। পৃথিবীর শৈশবাবস্থায় সরিসৃপ জাতীয় প্রাণীর কঙ্কালের খোঁজে নব্য এসিয়ায় তিনি যে বৈজ্ঞানিক অভিযানের নেতৃত্ব করেন, সে অভিযানের অসামান্য সার্থকতায় সমস্ত পৃথিবীর কাছে বাঙ্গলার মুখ উজ্জ্বল হয়েছিল। বাঙ্গলা দেশ থেকে এ রকম অভিযান যে হতে পারে তাই কেউ আগে ভাবতে পারেনি। তাঁর দ্বিতীয় অভিযান প্রাণীতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণার জন্যে নিউগিনীর অনাবিষ্কৃত প্রদেশে। সে অভিযানের ফলে প্রাণীবিদ্যা আশাতীতভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু তারপর থেকেই তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ বুঝি দেখা দেয়। তাঁর অদ্ভুত সব নতুন মতামত শুনে বৈজ্ঞানিক সমাজ তাঁর মাথা ঠিক আছে কিনা

সন্দেহ প্রকাশ করে। সার চিরঞ্জীব চিরদিন অত্যন্ত অহঙ্কারী প্রকৃতির। খ্যাতির শিখরে যতদিন তিনি ছিলেন ততদিন তাঁর প্রতিভার খাতিরে এ অহঙ্কার সকলে নিঃশব্দে সহ্য করেছে, কিন্তু তাঁর মানসিক দুর্ব্বলতার পরিচয় যেদিন তাঁর অদ্ভুত কথাবার্ত্তা ও মতামতের মধ্যে পাওয়া যেতে লাগল সেদিন কেউ কেউ যে আগেকার আক্রোশের শোধ নিতে ছাড়লে না এ কথা বলাই বাহুল্য। কাগজে তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে ব্যঙ্গ করে অনেক প্রবন্ধ বেরুল। প্রাচীন যুগের বিলুপ্ত এক ডাইনোসরের পিঠে চড়ে সার চিরঞ্জীব সহরের পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এই ব্যঙ্গ চিত্রটি তখনকার দিনে বিশেষ হাসির খোরাক জুগিয়েছিল। ব্যঙ্গ চিত্রটি অকারণে আঁকা হয়নি। বুদ্ধিভ্রংশের সঙ্গে সার চিরঞ্জীবের অদ্ভুত এক ধারণা হয়েছিল যে মেসোজোইক যুগের সরিসৃপের কঙ্কাল বলে বৈজ্ঞানিকেরা যেগুলি লক্ষাধিক বছরের পুরাণ মনে করেন সেগুলি নাকি অত পুরাণ মোটেই নয়। তিনি নাকি এমন সব ডাইনোসরের হাড় পেয়েছেন যেগুলি আধুনিক কালের বলে নিশ্চিত জানা যায়, তা ছাড়া তাঁর মতে সেই প্রাচীন সরিসৃপ বংশ নাকি এখনো একেবারে লুপ্ত হয়নি।

নানা দিক থেকে আঘাত খেয়ে আহত অভিমানের জন্যেই কিনা বলা যায় না সার চিরঞ্জীব শেষাশেষি একেবারে নিঃসঙ্গই

থাকতে আরম্ভ করেছিলেন। শহরের সীমা ছাড়িয়ে তাঁর নির্জ্জন বিশাল বাড়ীর পরীক্ষাগারের বাইরে তাঁর আর দেখাই পাওয়া যেত না। নিজেকে যেন তিনি সেখানে জীয়ন্তে কবর দিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে কোন কাগজ মজা করবার জন্যে বা অনুগ্রহ করে তাঁর যে দু'একটা লেখা ছাপত তাতেই তাঁর অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যেত। সে সমস্ত লেখায় অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সঙ্গে যে মানসিক বিকৃতির লক্ষণ দেখা যেত তাতে শত্রুপক্ষ হাসলেও অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক সমাজ এতবড় মনীষীর এমন পতনে বেদনাই অনুভব করতেন। কিন্তু ঘরে বসে আজগুবি সব ধারণা নিয়ে প্রবন্ধ লেখা এক কথা আর মানুষ খুনের দায়ে আসামী হওয়া আরেক কথা। এতটা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।

সে ঘটনার কথা মনে করলেও গা শিউরে ওঠে। শুধু সাধারণ নরহত্যা সে ত নয়, তার ভিতর যে উন্মত্ত পৈশাচিকতার পরিচয় ছিল তাতেই সকলে বেশী স্তম্ভিত হয়ে গেছল। সার চিরঞ্জীবের নির্জ্জন বাগান বাড়ীতে হঠাৎ একদিন তাঁর ভৃত্যকে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়। সাধারণভাবে সে খুন হয়নি। বদ্ধ উন্মাদ ছাড়া অমন নৃশংসভাবে নরহত্যা কেউ করতে পারে না। চাকরটির দুটি চোখ ওপড়ান এবং তার সর্ব্বাঙ্গের আঘাত দেখে মনে হয় ধারাল অস্ত্র দিয়ে কেউ যেন তার সারা গায়ের মাংস ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে।

সার চিরঞ্জীবের বিরুদ্ধে এ সম্পর্কে সব চেয়ে সন্দেহের কারণ এই যে তাঁকে যখন ধরা হয় তখন তিনি দমদম থেকে একটা এরোপ্লেন ভাড়া করে পালাবার চেষ্টা করছেন। পুলিশ

পুলিশের আদেশেও প্রথম তিনি নামতে রাজী হননি

খুব তৎপরতার সঙ্গে কাজ না করলে তাঁকে ধরতেই পারত না। এরোপ্লেনে তিনি উঠে বসে চালাবার উদ্যোগ করেছেন এমন

সময়ে পুলিশ দ্রুতগামী মোটরে গিয়ে তাঁকে ধরে। পুলিশের আদেশেও প্রথম তিনি নামতে রাজী হননি, বরং তাদের সামনেই প্রপেলার চালিয়ে দিয়ে উড়ে যাবার চেষ্টা করেন। বাধ্য হয়ে পুলিশ অফিসার তখন গুলি করে তাঁর প্রপেলার ভেঙ্গে দিয়ে তাঁকে থামায়। এরোপ্লেনে তাঁর সঙ্গে একটি বন্দুকও পাওয়া যায়।

এরোপ্লেন থেকে নামাবার পরও তাঁর রোক কমেনি; পুলিশের লোককে যা-নয়-তাই বলে গাল দিয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁকে ছেড়ে দেবার জন্যে জেদ করেন। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য জিজ্ঞেস করলে কিছুই বলতে চান না। তাঁর চাকরের হত্যা সম্বন্ধেও তাঁকে জিজ্ঞাসা করে কোন উত্তর পাওয়া যায় না। মস্তিষ্ক বিকৃতির পর তাঁর অহঙ্কারী প্রকৃতি যেন আরো উগ্র হয়ে উঠেছিল। পুলিশের প্রশ্নের উত্তরে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন যে তাঁকে যখন অকারণে এত অপমান করা হয়েছে তখন তাদের কোন কথার আর তিনি জবাব দেবেন না।

এই বিখ্যাত নরহত্যার মামলা আদালতে ওঠার পর কয়েক দিন পর্য্যন্ত খবরের কাগজগুলির উত্তেজনার আর অবধি ছিল না। মানুষের মুখে মুখেও এই উন্মাদ বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধে নানান অতিরঞ্জিত আজগুবি খবর তখন ফিরছে।

তারপর এই রোমাঞ্চকর হত্যার খবর কোথায় যে গেল

তলিয়ে কেউ তার সন্ধানও রাখলে না। দার্জ্জিলিঙ্গের বিমান ডাকের ভয়ঙ্কর রহস্য তখন মানুষের মন ও সংবাদ পত্রের পাতা জুড়ে চলেছে।

তখন সবে কলকাতা থেকে দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত এরোপ্লেনে ডাক পাঠাবার ব্যবস্থা হয়েছে। সেই ডাকবাহী বিমানপোত আশ্চর্য্যভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল একদিন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর ঘন টেরাইএর জঙ্গলে ভাঙ্গা এরোপ্লেনটির সন্ধান যদি বা মিলল, তার চালকের কোন পাত্তা নেই। কেমন করে যে এরোপ্লেনটি ধ্বংস হল তারও কোন সন্তোষ-জনক মীমাংসা করা গেল না।

শুধু এই ব্যাপারেই শেষ হলে হয়ত সাধারণের আতঙ্ক এত বেশী হ'ত না। কিন্তু এ ব্যাপারের রহস্য আরও গভীর হয়ে উঠল পরের ঘটনায়। একজন ইংরাজ বিমানবীর জলপাইগুড়ি থেকে এরোপ্লেনে কলকাতা আসছিলেন তার পরের দিন ভোরের বেলা। কিন্তু যাত্রা করবার খানিক বাদেই তাঁর এরোপ্লেনটিও অদ্ভুতভাবে ভেঙ্গে পড়ে তিস্তা নদীর ওপর। তিস্তার অনেক জেলে-নৌকা থেকে জেলেরা তাঁর পড়ার দৃশ্য দেখেছিল। তাদের জিজ্ঞাসা করে জানা যায় যে ভোরের রাত্রে আবছা অন্ধকারে তারা চোখে ভাল না দেখতে পেলেও এরোপ্লেনের আওয়াজ বেশ স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিল।

হঠাৎ উর্দ্ধ আকাশ থেকে কি রকম বেয়াড়াভাবে এরোপ্লেনটি মাতালের মত পাক খেতে খেতে নামতে থাকে। নীচে নেমেও এরোপ্লেনটি আর একবার ওপরে গোঁত খাওয়া ঘুড়ির মত উঠেছিল কিন্তু বেশীদূর নয়। তারপর সশব্দে তিস্তার জলে সেটি ভীষণ বেগে এসে পড়ে। এবারে এরোপ্লেনের ভেতর ইংরাজ চালকের মৃতদেহ পাওয়া যায়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তার সমস্ত মুখ ক্ষত-বিক্ষত এবং একটি চোখ খোবলান।

এই ভয়ঙ্কর খবর বাসি হতে না হতেই পরের দিন সংবাদ পাওয়া যায় যে দার্জ্জিলিং থেকে সন্ধ্যায় ফেরার সময় আরেকটি ডাকবাহী বিমানপোত টেরাই জঙ্গলের ওপর পূব দিকের আকাশ প্রান্তে দুটি অদ্ভুত আকারের বিমানপোত দেখেছে। ভাল করে লক্ষ্য করার আগেই সেগুলি সন্ধ্যার অন্ধকারে অস্পষ্ট হয়ে যায়।

এই রহস্যময় দুটি অজানা বিমানপোতের খবরে এবার দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সাড়া পড়ে গেল। ভাল করে খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে আই. এন. এ. অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ারওয়েজের জানিত এরোপ্লেন সেদিন ওদিকে যায়নি। তা ছাড়া বিমান ডাকের চালক যে ভাবের বর্ণনা দিয়েছিল সে ধরণের বিমানপোত ভারতের কোথাও ত নেই।

নূতন এই আতঙ্কের হুজুগে সার চিরঞ্জীব রায়ের মামলা কোথায় যে চাপা পড়ে গেল কে জানে। খবরের কাগজের কোণে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লোকের বোধ হয় আর চোখেও পড়ে না।

প্রত্যেকে আমরা তখন খবরের কাগজ খুলেই এরোপ্লেন রহস্যের সংবাদ রুদ্ধ নিশ্বাসে পড়তে আরম্ভ করি। প্রতিদিন উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকি এ রহস্যের ওপর নূতন কোন আলোক সম্পাত হল কিনা তা জানবার আশায়!

হাজার রকমের গুজব ও আলোচনা চারিধারে চলতে থাকে। এ অদ্ভুত অজানা বিমানপোত দুটি কাদের? যে দুটী এরোপ্লেন আশ্চর্য্যভাবে ধ্বংস হয়েছে তাদের ভেঙে পড়ার সঙ্গে এদের সম্পর্ক আছে কিনা? আপাততঃ কোন দেশের সঙ্গে যখন আমাদের কিম্বা কারুর যুদ্ধ বা বিরোধ নেই তখন এমনভাবে কারা নিরীহ আকাশ-পথের যাত্রীদের আক্রমণ করছে, তাদের উদ্দেশ্যই বা কি? এ সমস্ত প্রশ্নের কোন উত্তর কেউ দিতে পারলে না। শুদ্ধ চারিধারে আতঙ্কই বেড়ে যেতে লাগল।

আই. এন. এ. বাধ্য হয়ে বাঙ্গলার উত্তরাঞ্চলে রাত্রে এরোপ্লেন চালান বন্ধ করে দিলে, কারণ দেখা গেল যে বেশীর ভাগ দুর্ঘটনা রাত্রেই ঘটছে। ডাকবাহী বিমানপোত ও ইংরাজ চালকের এরোপ্লেনের পর আরো তিনটি এরোপ্লেন ওই অঞ্চলে

রাত্রে ভেঙে পড়ে। আরোহীদের অধিকাংশ সময়ে পাত্তা পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলেও দেখা যায় তাদের দেহ ছিন্ন-ভিন্ন।

শুধু আকাশ পথে এরোপ্লেনই নয়—সাধারণ লোকও আক্রান্ত হয় অনেকে। রঙ্গপুরের একটি গ্রামের রাস্তায় একদিন সকালে একজন চাষীর ক্ষত-বিক্ষত দেহ দেখতে পাওয়া যায়। রাত্রে সে তার হারান বলদের খোঁজে বাইরে বেরিয়ে ছিল! অনেকে অবশ্য এ ব্যাপারটির সঙ্গে রহস্যময় এরোপ্লেন ছুটির কোন সংস্রব আছে তা স্বীকার করতে চান না। কিন্তু সেই গ্রামের একজন বৃদ্ধ বলে যে সেদিন রাত্রে আকাশে অদ্ভূত এক রকম আওয়াজ সে শুনেছিল।

সত্য মিথ্যা নানারকম খবর এইবার রটতে থাকে। হুজুগের দিনে খবরের কাগজগুলি বাদ বিচার না করে তার সবগুলিকেই প্রায় স্থান দেয় নিজেদের পাতায়। আমাদের কাগজের মফঃস্বল বার্ত্তাগুলি একেই যত গাঁজাখুরী সংবাদের ডিপো। মফঃস্বলের প্রতিনিধিরা সুযোগ পেয়ে যা খুসী আষাঢ়ে গল্প সেখানে চালাতে থাকে। কোথায় জলপাইগুড়ি অঞ্চলের এক গাঁয়ের এক বুড়ির বাছুর হারিয়েছে। মফঃস্বল বার্ত্তায় তার খবরের সঙ্গেও বেরোয় যে সে বুড়ি নাকি দেখেছে আকাশ থেকে প্রকাণ্ড একটা কি জিনিষ তার বাছুরকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে।

বন্ধু অশোক রায়ের বৈঠকখানায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিলাম সেদিন সকাল বেলা। এই খবরটা হঠাৎ চোখে পড়ায় হেসে উঠে অশোককে বল্লাম,—"খবরটা দেখেছো। এরপর কোনদিন শুনব আকাশ থেকে কি একটা নেমে কার হেঁসেল থেকে মাছ ভাজা চুরি করে নিয়ে গেছে—আমাদের দেশে একটা কিছু হুজুগ হলেই হ'ল।"

অশোক রায় খবরটার ওপর কিন্তু আগ্রহভরেই যেন চোখ বুলিয়ে গম্ভীর মুখে বল্লে,—"হাসি ঠাট্টার কথা এ নয়। বিপদ অত্যন্ত গুরুতর। আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি আই. এন. এ. বা আর কেউ এ সম্বন্ধে আর কিছু এখনো করছে না দেখে।"

ঠাট্টা করেই বল্লাম—"বেশ ত তোমারও ত নিজের প্লেন রয়েছে। তুমিই এ আজগুবি এরোপ্লেনের রহস্য ভেদ করবার জন্যে লাগো না।"

ঠাট্টা করে যে কথা বলেছিলাম অশোক অত্যন্ত গম্ভীর মুখে তার যা উত্তর দিলে তা শুনে প্রথমটা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

অশোক বল্লে—"লাগবোই ত ঠিক করেছি।"

খানিকক্ষণ আমার মুখ দিয়ে সত্যিই কথা বেরুল না। তারপর অস্ফুট স্বরে বল্লাম—"তুমি পরিহাস করছ নিশ্চয় ?"

"না, পরিহাস নয়, সত্যিই আমি যাবো ঠিক করেছি এবং আজই।"

আমি এবার ব্যাকুল স্বরে বল্লাম—"কিন্তু তুমি সমস্ত ব্যাপারটা ভেবে দেখেছ ? এ পর্য্যন্ত কতজন বৈমানিক মারা গেছে তা জানো! তাদের মধ্যে ওস্তাদ সমস্ত বিমান-বীরও ছিল। তুমি ত সবে সেদিন বি সার্টিফিকেট পেয়েছ। তা ছাড়া তোমার প্লেনও ডাকের উড়োজাহাজগুলির তুলনায় অনেক খারাপ।

অশোক বল্লে—"বিপদ আছে জেনেই ত যাচ্ছি।"

আমি আর একবার তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম—"বিপদ যে কতখানি তা কিন্তু তুমি বোধ হয় বুঝতে পারছ না। এই রহস্যময় এরোপ্লেনগুলি যারা চালাচ্ছে তারা যেমন পৈশাচিকভাবে নিষ্ঠুর, তেমনি ধূর্ত্ত ও শক্তিমান। আই. এন এ. কিছু করছে না এমন ত নয়। তারা দল বেঁধেও কিছু করতে পারছে না এদের বিরুদ্ধে। তারা যা পারছে না, তুমি একলা কি করতে পার!"

অশোককে কিন্তু নিরস্ত করা গেল না, সে শুধু অদ্ভুত এক উত্তর দিলে—"হয়ত আই. এন. এ.-র চেয়ে আমি এ ব্যাপারের মর্ম্ম বেশী বুঝি। অন্ততঃ কোথায় তাদের দেখা পাব তা আমি জানি।"

তার কাছ থেকে আর কোন কথা না বার করতে পেরে আমি অবশেষে হতাশ হয়ে বল্লাম—"নেহাৎই যখন যাবে তখন আমি তোমার সঙ্গ ছাড়ছিনে।"

অশোক খানিকক্ষণ আমার দিকে নীরবে চেয়ে থেকে বল্লে, "এ প্রস্তাব তোমার কাছ থেকে আমি আশা করছিলাম।"

সেই দিন দুপুরেই অশোকের প্লেনে আমরা কলকাতা থেকে রওনা হলাম। অশোকের প্লেনটি খুব দামী নয় কিন্তু বেশ মজবুত। টেনে-টুনে তাকে ঘণ্টায় ১৭৫ মাইলও চালান যায়। সামনে অশোক ও পেছনে আমার সীট। অশোকের অনুরোধে একটি বাইক্‌ল ও একটি রিভলবার নিয়ে আমায় উঠতে হয়েছে। এবং আরেকটি জিনিষ সে যে কেন সঙ্গে আনতে বলেছিল কিছুই বুঝতে পারিনি। সেটি একটি লোহার শিরস্ত্রাণ, মধ্যযুগের ধরণে তৈরী।

আই. এন. এ. রাত্রে এরোপ্লেন চালান নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। তাই জন্যে আমরা ঠিক করেছিলাম গ্রামে গন্তব্যস্থানে দিনের বেলা পৌঁছে গোপনে রাত্রে কাজ আরম্ভ করব। গন্তব্যস্থান অবশ্য আমার জানা ছিল না। উত্তর দিকে যাত্রা করে ঘণ্টা কয়েক বাদে জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকোটায় পৌঁছে আমি

অবাক হয়ে গেলাম। এত জায়গা থাকতে এই সহরটিতে অশোকের থাকার কারণ তখনও আমি বুঝতে পারিনি।

কিন্তু নাগরাকোটায় প্রধান অসুবিধা হল এরোপ্লেন নামবার জায়গার। দিনের বেলা নগরের বাইরে যে ফুটবলের মাঠে আমরা নেমেছিলাম, রাত্রে অন্ধকারে তাতে অবতরণ করা অসম্ভব। অনেক খোঁজাখুঁজির পর দূরের একটি গাঁয়ের ধারে প্রকাণ্ড একটা বাঁজা মাঠ পাওয়া গেল কিন্তু জোরালো আলোর বন্দোবস্ত না করতে পারার দরুণ প্রথম রাত্রে আমাদের কিছু করা আর হল না। দ্বিতীয় রাত্রে যথাসম্ভব জোরালো তুটি পেট্রোলের আলো মাঠের তুধারে চিহ্ন হিসাবে রেখে মাঝ রাত্রে আমরা আকাশে উঠলাম।

সেই ভয়ঙ্কর রাত্রির কথা কোনদিন বোধ হয় ভুলতে পারব না। উত্তেজনার ঝোঁকে এতদূর এগিয়ে এলেও সেই সময়ে মনে যে একটু দ্বিধা না হচ্ছিল এমন নয়।

যে রহস্যময় শত্রুর বিরুদ্ধে আমরা অভিযান করছি তাদের নৃশংসতার ও শক্তির পরিমাণ আমাদের অজানা নয়। আমাদের সামান্য শক্তি নিয়ে আমরা তাদের বিরুদ্ধে কি করতে পারব! মনে হচ্ছিল মৃত্যুকে নিছক খোঁজাখুঁজি করে ডেকে আনছি। কিন্তু তখন আর পেছবার সময় নেই।

জয়ষ্টিক টেনে ধরার সঙ্গে সঙ্গে গর্জ্জন করে এরোপ্লেন

তখন মাটি ছাড়িয়ে উঠেছে। একটিমাত্র ক্ষীণ আশা তখনও মনের মধ্যে আছে, হয়ত সত্যিই আমরা কিছুর দেখা নাও পেতে পারি। কিন্তু সে আশাও সফল হবার নয়।

দেখতে দেখতে এরোপ্লেন কয়েকবার পাক খেয়ে অনেক ঊর্দ্ধে উঠে পড়ল। নাগরাকোটায় সহরের ক্ষীণ আলো দূরে থাক আমাদের নামবার মাঠের চড়া আলোও তখন প্রায় অস্পষ্ট হয়ে গেছে। যা-কিছু আলো আমাদের মাথার ওপরে। সেখানে তারায় ভরা আকাশ জ্বলজ্বল করছে। শুক্লপক্ষের দশমী না একাদশী তিথির ভাঙা চাঁদের সামান্য একটু লালচে রেখা পশ্চিম দিগন্তে দেখা যাচ্ছিল। মাটির ওপর থেকে সে চাঁদ অনেক আগেই অদৃশ্য হয়ে গেছে। আমরা অনেক উঁচুতে উঠেছিলাম বলে এখনো তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম। সে রেখাও খানিক পরে মুছে গেল। তারাগুলির আলো ছাড়া আর কোথাও কিছু নেই। নীচে সমস্ত পৃথিবীর ওপর গাঢ় কালীর ছোপ। সে ছোপ কোথাও বেশী গাঢ় কোথাও বা একটু ফিকে। সেই সামান্য একটু রঙের তারতম্য থেকেই আমরা মাঠ, গ্রাম ও জঙ্গলকে যথাসম্ভব আলাদা করে ধরতে পারছিলাম।

সহরের ওপর কয়েকবার চক্কর দিয়ে অশোক উত্তরে জঙ্গলের ওপর প্লেন চালিয়ে এনেছিল। আমাদের গতি তখন খুব

বেশী নয়, ঘণ্টায় আন্দাজ ৮০ মাইল বেগে মাটি থেকে হাজার তিনেক ফিট ওপরে আমরা বিশাল বৃত্তাকারে জঙ্গলের ওপর পাক খাচ্ছিলাম। গ্রীষ্মকালে উপযুক্ত বৈমানিকের পোষাক থাকা সত্ত্বেও ঝড়ের মত যে হাওয়া আমাদের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল তাতে যেন শীত করছিল। মোটরের গর্জ্জন ছাড়া আর কিছু শব্দ নেই, তারাখচিত অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখবার নেই।

খানিকক্ষণ বাদে এই একঘেয়েমিতে যেন বিরক্তি ধরে গেল। মোটরের আওয়াজের ভেতর কথা কইবার সুবিধের জন্যে অশোকের ও আমার বসবার জায়গার মধ্যে দুটো চোঙ্ লাগান রবারের নল আমরা লাগিয়ে নিয়েছিলাম। সেই চোঙের ভেতর দিয়ে বল্লাম—"এরকম ভাবে কতক্ষণ ঘুরবে। এতে লাভই বা কি ?"

অশোক চোঙের ভিতর দিয়ে উত্তর দিলে—"অত অধৈর্য্য হোয়ো না। রাত্রে ওড়ার একটা আনন্দও ত আছে।"

আমার কিন্তু এটাকে ঠিক আনন্দ বলে মনে হচ্ছিল না। যাই হোক এ নিয়ে তর্ক করা বৃথা বলে চুপ করে গেলাম। তারপর কতক্ষণ যে আমরা সেই একভাবে চক্কর দিয়েছিলাম তা বলতে পারি না। পূবের আকাশ যখন একটু ফিকে হয়ে আসছে প্রভাতের সূচনায়, তখন আমার খেয়াল হল। আমার

চোঙের ভেতর দিয়ে বল্লাম—"সকাল ত হতে চলল। আর কতক্ষণ ঘুরবে এমন করে ?"

চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে জবাব এল—"শীগগীর তোমার শিরস্ত্রাণ পরে ফেলে প্রস্তুত হয়ে বস।"

সত্যিসত্যিই সেই কথায় একটা ঠাণ্ডা স্রোত যেন সমস্ত শরীরের ভেতর দিয়ে বয়ে শিউরে দিয়ে গেল।

বল্লাম—"দেখতে পেয়েছ ?"

"হ্যাঁ, আমাদের দক্ষিণে চেয়ে দেখ। আমি এরোপ্লেনের বেগ বাড়িয়ে আরো ওপরে উঠছি। সেখান থেকে ওদের ওপর ছোঁ মেরে পড়তে চাই—অবশ্য যদি ওদের বেগ আমাদের চেয়ে বেশী না হয়।"

এরোপ্লেন হঠাৎ কাণিক খেয়ে ওপর দিকে নাক তুলে প্রচণ্ড বেগে উঠতে লাগল। সেই মুহূর্তে আমিও দেখতে পেলাম।

অন্ধকার তখনও বেশ গাঢ়, কিন্তু তাহার ভেতর দুটি বিশাল জিনিষের আবছায়া মূর্তি বেশ স্পষ্টই বোঝা যায়।

কিন্তু এ কি ধরণের এরোপ্লেন। আমি এরকম এরোপ্লেনের কথা কখন শুনিনি। সামনে তার কোন প্রপেলার আছে কিনা বোঝা যাচ্ছিল না, কিন্তু অনেকটা বাদুড়ের ধরণে তাদের দু'ধারের ডানা যে ওঠা-নামা করছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ

নেই। এ পদ্ধতিতে কোন এরোপ্লেন নির্ম্মিত হতে পারে আমার জানা ছিল না।

এরোপ্লেন দুটির আকৃতিও অদ্ভুত। অস্পষ্টভাবে যেটুকু দেখতে পাচ্ছিলাম তাতে মনে হল কোন সাধারণ প্লেনের সঙ্গে তাদের কোন মিল নেই।

তাদের বেগ বেশী হোক না হোক, আশ্চর্য্য তাদের ঘোরা ফেরার কৌশল। সাধারণ এরোপ্লেনকে অনেকখানি জায়গা জুড়ে মোড় ফিরতে হয় কিন্তু এরা যেন যে কোন জায়গা থেকে যেদিকে খুশী হঠাৎ বাঁক নিতে পারে। সামনে যেতে যেতে হঠাৎ ডিগবাজি খেয়ে সোজা পেছন দিকে যাওয়া এদের পক্ষে অত্যন্ত সহজ।

সবেগে এরোপ্লেন চালিয়েও এই কৌশলের জন্যেই কিছুতেই আমরা তাদের বিরুদ্ধে সুবিধে করতে পারছিলাম না। ওপর থেকে তাদের কাছ দিয়ে চিলের মত ছোঁ মেরে নামবার আগেই তারা অদ্ভুত কৌশলে আমাদের কাছ থেকে সরে যাচ্ছিল। গুলি করবার মত নাগালের মধ্যে তাদের কিছুতেই পাচ্ছিলাম না।

প্রথমে ভেবেছিলাম তারাও বুঝি দূর থেকে আমাদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে পারে। কিন্তু সে রকম কোন লক্ষণ দেখা গেল না। তারা যেন শুধু কোন রকমে আমাদের প্লেনের ল্যাজের দিকটা আক্রমণ করার ফিকির খুঁজছে মনে হল।

বন্দুক বা কোন অস্ত্র তারা কেন যে ব্যবহার করেনি তা অবিলম্বেই বুঝলাম, এবং সেই সঙ্গে সত্যই আতঙ্কে ওই ঝোড়ো হাওয়ার ভেতরেও আমি ঘেমে উঠলাম।

পূবের আকাশ ফিকে হতে হতে তখন বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। আকাশের তারা ম্লান আর নীচের মাঠ গ্রাম জঙ্গল স্পষ্ট হয়ে আসছে। এমন সময় আমাদের প্লেন তাদের শ'দুয়েক গজের মধ্যে একবার এসে ছুটে বেরিয়ে গেল। স্তম্ভিত হয়ে দেখলাম—যাদের এরোপ্লেন ভেবেছিলাম তারা মানুষের তৈরী কোনপ্রকার যন্ত্র নয়, কল্পনাতীত এক রকম প্রাণী, অতিবড় দুঃস্বপ্নেও যাদের রূপ ভাবা যায় না। আবছা অন্ধকারে তাদের বিশাল দেহ ও বাদুড়ের মত হিংস্র দাঁতাল মুখের যে আভাষ আমি পেয়েছিলাম, তার সঙ্গে অতীত বা বর্ত্তমানের কোন প্রাণীরই মিল নেই।

নিজের চোখকে প্রথমটা বিশ্বাস করা শক্ত হলেও খানিকক্ষণের মধ্যেই বুঝলাম, ভুল আমার হয়নি। যতই অবিশ্বাস্য হোক, সত্যই অদ্ভুত ভয়ঙ্কর দুটি প্রাণীর সঙ্গে আমাদের আকাশ-যুদ্ধে নামতে হয়েছে।

অশোক নলের ভেতর দিয়ে উত্তেজিত স্বরে বল্লে—"কার সঙ্গে লড়তে হবে এবার বুঝতে পেরেছ ?"

আমি বিস্মিত-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম—"তুমি কি আগেই জানতে?"

উত্তর এল—"না, ঠিক জানতাম না, কিন্তু একটু আঁচ করেছিলাম।"

আর আমাদের যেন কথা হল না। কথা কইবার আর সময়ও ছিল না। অন্ধকার কেটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শত্রুদের চেহারা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। পরস্পরকে বাগে পাওয়ার জন্যে তখন আকাশে তাদের সঙ্গে আমাদের প্লেনের অদ্ভুত প্রতিযোগিতা চলেছে। কিন্তু সে প্রতিযোগিতায় আমরাই যেন ক্রমশঃ বেকায়দায় পড়ছিলাম মনে হচ্ছিল।

আমাদের এরোপ্লেনের গতি হয়ত তাদের চেয়ে বেশী কিন্তু তাদের ওড়বার কৌশল আমাদের চেয়ে ভালো। আমি এর মধ্যে কয়েকবার দূর থেকে বন্দুক চালিয়েছি। কিন্তু তাতে কিছু সুবিধে হয়নি। পাখার নানারকম কায়দায় উল্টে-পাল্টে তারা শুধু আমাদের এড়িয়েই যাচ্ছিল না, দুটোতে আমাদের দু'পাশে সরে গিয়ে আমাদের পেছন দিকে আক্রমণ করবার সুযোগও করে নিচ্ছিল।

কিন্তু আক্রমণের কৌশল যে তাদের অমন হবে, আক্রান্ত হবার আগের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমরা ভাবতে পারিনি। খানিক আগেই একবার সুবিধে পেয়ে আমি তাদের একটির পাংলা

চামড়ার ডানা একটি গুলিতে ফুটো করে দিয়েছি। তাতে সে খুব বেশী জখম হয়নি কিন্তু যে ভয়ঙ্কর চীৎকার ছেড়েছে, আমাদের মোটরের গর্জ্জন ছাপিয়েও তীক্ষ্ণভাবে তা আমাদের কাণে এসে বিঁধেছে। আমাদের প্লেন তাদের একটিকে পাশে রেখে তাদের আরেকটির শ'দুএক ফুট তলা দিয়ে এখন যাচ্ছিল। আমি ওপর দিকে লক্ষ্য রেখে বন্দুকও ছুঁড়েছিলাম। হঠাৎ ভয়ঙ্করভাবে আমাদের প্লেন দুলে উঠে পাক খেতে খেতে নীচের দিকে প্রচণ্ড বেগে পড়তে সুরু করল। প্লেনের সীটের ধারটা সজোরে সে সময়ে ধরে না ফেললে আমি বোধ হয় ছিটকেই পড়ে যেতাম।

হল কি ! কি আর হবে। শকুনেরা যেমন করে উঁচু থেকে নামবার সময় পাখা মুড়ে ভারী জিনিষের মত অনেকদূর দ্রুতবেগে পড়ে যায় ঠিক তেমনিভাবে সেই বিশাল প্রাণীটি আমাদের পেছনের পাখার ওপর এসে পড়েছে। এই সুযোগেরই সে অপেক্ষা করছিল।

প্রথমটা সত্যই অমি বিমূঢ় হয়ে গেছলাম, এই আক্রমণের আকস্মিকতায় ও বিপদের ভীষণতায়। হাতের বন্দুকটা তুলে ধরবার কথাও আমার মনে ছিল না। প্লেন পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হচ্ছিল বিদ্যুৎবেগে নীচের মাঠ ঘাট জঙ্গল আমাদের দিকে ছুটে আসছে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে

মাটিতে আছাড় খেয়ে যখন মরতেই হবে তখন আর বন্দুক ছুঁড়ে লাভ কি।

কিন্তু সে বিমূঢ়তা আমার কেটে গেল অশোকের কথায়। এত বিপদের ভেতরেও সে তাহলে মাথা ঠিক রেখেছে। চোঙের ভেতর দিয়ে সে চীৎকার করে বল্লে,—"দেখছ কি, গুলি কর, আমি প্লেনকে সামলে নিচ্ছি।"

এইবার সামনে আমি ভাল করে চেয়ে দেখলাম।

সে দিকে চেয়ে অবশ্য মাথা ঠিক রাখা শক্ত। সামনের ও পেছনের পায়ের হিংস্র নখরে আমাদের প্লেনের পেছনের দিকটা আঁকড়ে ধরে একটু একটু করে সেই ভয়ঙ্কর প্রাণী আমার দিকে এগিয়ে আসছে। তার হিংস্র দাঁতাল মুখ একেবারে আমার সামনে। জানোয়ারটিকে বর্ণনা করা কঠিন। অতিকায় একটা গোসাপের সামনের পা দুটো থেকে বাদুড়ের মত পাতলা চামড়ার ডানা বেরিয়েছে বল্লে তার খানিকটা বর্ণনা হয় কিন্তু তার হিংস্র মুখের ও সাপের মত কুটীল ভয়ঙ্কর চোখের ভীষণতা বোঝান যায় না।

অনেক সামলাবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও তখন আমাদের প্লেন পেছনের ল্যাজের ভারে টাল হারিয়ে একেবারে মাটির কাছাকাছি এসে পড়েছে। সেই সময়ে দাঁতে দাঁত চেপে সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করে আমি বন্দুকের নলটা সেই হিংস্র প্রাণীর

একেবারে দাঁতাল মুখের ভিতর ঢুকিয়ে দিলাম, এবং তারপরই দুটো ঘোড়াই দিলাম পর পর টিপে।

আর কিছু দরকার হল না। প্লেনের ওপর একবার একটু নড়ে উঠেই জানোয়ারটা গড়িয়ে পড়ে গেল নীচে। আমাদের বিমানপোতও আছাড় খেতে খেতে হঠাৎ তীরের মত ওপরে উঠে গেল ভারমুক্ত হয়ে।

পূবের আকাশ তখন লাল হয়ে উঠেছে। কপালের ঘাম মুছে আমি চোঙের ভেতর দিয়ে বল্লাম, "এবার ত নামতে হয়!"

"না আরেকটা যে এখনো বেঁচে আছে।"—জানালো অশোক।

"কিন্তু আমার বন্দুক যে জানোয়ারটার সঙ্গে পড়ে গেছে।"

"বন্দুক পড়ে গেছে!"—সবিস্ময়ে চীৎকার করে উঠে অশোক খানিক চুপ করে রইল, তারপর আবার বল্লে,— "তাহলেও ফেরা যায় না। এমন সুযোগ আর কখন পাব কিনা সন্দেহ। এ ভীষণ জানোয়ার বেঁচে থাকলে আরো কত সর্ব্বনাশ করবে কে জানে! তুমি প্যারাসুট দিয়ে নামবার জন্যে প্রস্তুত থাক।"

সে যে কি করতে চায় কিছুই বুঝতে না পেরে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। আর একটি জানোয়ারের নাগাল আমরা

তখন প্রায় ধরে ফেলেছি। চারিদিক আলোকিত হয়ে ওঠার দরুণ কিম্বা তার সঙ্গীর মৃত্যু টের পেয়ে ভয় পাবার দরুণ কিনা বলা যায় না, সে তখন আক্রমণের বদলে পালাবার ফিকিরই খুঁজছে। বিশাল পালকগুলো সবেগে আন্দোলিত করে পশ্চিম দিকের ঘন জঙ্গলের দিকেই সে যাবার চেষ্টা করছে মনে হল।

অশোক হঠাৎ চোঙের ভেতর দিয়ে বল্লে,—"লাফিয়ে পড় এইবার।"

কিন্তু লাফাব কি! আমি তখন অশোকের কাণ্ড দেখে বিমূঢ় হয়ে গেছি। আমাদের প্লেন সোজা সেই জানোয়ারটির দিকে বন্দুকের গুলির মত ছুটে চলেছে। যন্ত্র-পাতি সব ঠিক করে, অশোক তার বসবার খোলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এবার শুধু তার গাটুকু ধরে বাইরে ঝুলে পড়ল। তার ইঙ্গিতে আমিও তখন তাই করেছি। তারপর একটি দুটি তিনটি সেকেণ্ড। তারই ইসারায় এবার হাত ছেড়ে দিয়ে শূন্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম। প্যারাস্যুটের বোতাম টেপবার আগেই শুনতে পেলাম, ওপরে ভয়ঙ্কর সজ্ঘর্ষের আওয়াজ। আমাদের এরোপ্লেন প্রচণ্ডবেগে গিয়ে জানোয়ারটিকে আঘাত করেছে।

আমাদের প্যারাস্যুট খোলার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একরকম গায়ের পাশ দিয়েই সেই ভয়ঙ্কর প্রাণীটির মৃতদেহ সশব্দে

মাটিতে গিয়ে পড়ল। আমাদের এরোপ্লেনটি মাতালের মত তখনও পড়তে পড়তে পাক খাচ্ছে।

নাগরাকোটা থেকে ট্রেণে কলকাতায় পৌঁছোবার আগেই আমাদের খবর কি রকম ভাবে সেখানে পৌঁছে গেছল। এই আশ্চর্য্য জানোয়ারের মৃত্যুর খবরে সেখানে কি রকম চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল, আই. এন. এ. থেকে আমাদের বিশেষতঃ অশোককে কি রকম সম্মান করা হয়েছিল, সে সব খবর অনেকেরই জানা।

এখানে শুধু আমাদের এই অভিযানের অদ্ভুত পরিণতির কথা বলব।

সে পরিণতি সার চিরঞ্জীবের মুক্তি। শুধু মুক্তি নয় বৈজ্ঞানিক হিসাবে এই ব্যাপারে তাঁর খ্যাতির পুনরুদ্ধারও হয়ে গেল।

যে ভয়ঙ্কর প্রাণী দুটিকে আমরা মেরেছিলাম, সার চিরঞ্জীব নিউগিনী অভিযান থেকে তাদের ডিম এনে কৃত্রিম উপায়ে অদ্ভুত কৌশলে তাঁর পরীক্ষাগারে ফুটিয়ে তাদের ছানাগুলিকে লালন করছিলেন একদিন বৈজ্ঞানিক জগৎকে দেখিয়ে স্তম্ভিত করে দেবেন বলে। কিন্তু জানোয়ারগুলি আশাতিরিক্ত ভাবে

বেড়ে উঠে একদিন হঠাৎ তাঁর চাকরের অসাবধানতায় তাদের খাঁচা থেকে বেরিয়ে পড়ে। চাকরটিকে অমন নৃশংসভাবে তারাই হত্যা করেছিল।

তারা ছাড়া পেয়ে কি ভয়ঙ্কর সর্ব্বনাশ করতে পারে তা বুঝেই সার চিরঞ্জীব বন্দুক নিয়ে এরোপ্লেনে তাদের মারবার জন্যে বেরুচ্ছিলেন। পুলিশ তাঁকে সেই অবস্থায় বাধা দেওয়ায় অত্যন্ত অপমানিত বোধ করে তিনি মৌনতা অবলম্বন করেন।

অশোক সার চিরঞ্জীবের খুনের রহস্যের সঙ্গে এই বিমান-ডাকের রহস্যের যোগসূত্র হঠাৎ একদিন আশ্চর্য্যভাবে আবিষ্কার না করলে অবশ্য সব দিক দিয়েই সর্ব্বনাশ হয়ে যেত। মফঃস্বল সংবাদে বুড়ির বাছুর চুরির যে সংবাদকে আমি পরিহাস করেছিলাম, তাই থেকেই কিন্তু জানোয়ার দুটিকে কোথায় সন্ধান করতে হবে, অশোক তার আভাষ পায়। নইলে নাগরাকোটার নামও সে জানত না দুদিন আগে।

সত্যবাদী সুকু

সুকুকে তোমরা নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছ ?

সেই যে তোমাদের ক্লাশের ফার্স্ট বেঞ্চিতে বসে থাকে—গোলগাল ভাঁটার মত মুখওয়ালা ছেলেটি। শীতকালে কানে মাথায় কম্ফর্টার জড়িয়ে থাকে সারা দিন, পাছে ঠাণ্ডা লাগে, আর গ্রীষ্মকালে পাছে তাত লাগে গায়ে ব'লে টিফিনের সময় ক্লাশ থেকে খেলতে বেরোয় না ! সেই যে মাষ্টারের খোসামুদে ছেলেটি, ক্লাশে মাষ্টার মশাই চেয়ার টেনে বসতে না বসতে নিজের বইটা দেয় এগিয়ে, আর হোম-টাস্কের পাঁচটা অঙ্কের

জায়গায় দশটা অঙ্ক কষে আনে, যেন ভুল করে-ই। কতখানি পড়া দিয়েছিলেন মাষ্টার মশাই নিজে ভুলে গেলেও যে গায়ে পড়ে দেয় মনে করিয়ে, আর পাশের ছেলে অঙ্কের রেজাল্টটা মিলোতে চাইলে যে খাতাটা কাৎ করে, হাত দিয়ে আড়াল করে ধরে। সেই সুকুর এত সব গুণের সেরা গুণ হ'ল তার সত্যবাদিতা।

এমন সত্যের প্রতি অনুরাগ এ বয়সে বুঝি কখনও দেখা যায় না! থার্ড্ বেঞ্চিতে হরিপদ সেদিন উপক্রমণিকাটা আনতে ভুলে গেছে। অনন্ত পণ্ডিতের ক্লাশে বই না নিয়ে এলে নিস্তার নেই, যতক্ষণ তিনি পড়াবেন ততক্ষণ সকলের বই হাতে ধরে বসে থাকতে হবে। অনন্ত পণ্ডিতের রাম গাঁট্টাব ভয়ে হরিপদ উপক্রমণিকার বদলে ভূগোলটা হাতে ধরে বসেছে, আর তাই দেখে পাশের শশী বুঝি হেসে ফেলেছে খুক্ করে।

অনন্ত পণ্ডিত 'গজ গজৌ' থামিয়ে বল্লেন, "হাসলি কে রে? গজ শব্দ শুনে হাসি পেল কোন দিগ্‌গজের?"

সবাই চুপ। আলপিন ফেললে শব্দ শোনা যায়, কিন্তু আলপিন ফেলবে কে? নেহৎ না ফেললে নয়, নিঃশ্বাস ফেলছে সবাই ভয়ে ভয়ে।

অনন্ত পণ্ডিত হাঁকলেন—"নিজের নাম শুনে হাসি পেল কোন্ গজাননের? এগিয়ে এস ত বাপু!"

এগিয়ে আর কে আসবে। সবাই কাঠ হয়ে আছে বসে।

"অসাড়ে হেসে ফেলেছ বুঝি, হেসেছি তবু জানতে পারিনি—কেমন? কিরে! কেউ কিচ্ছু জানিস্ না?" অনন্ত পণ্ডিত চোখ দুটো বেঞ্চিগুলোর উপর দিয়ে বুলিয়ে নিলেন।

তারপর, কেন হেসেছিলে বল ত' বাপু?

জানলেও এটা কি তা বলবার সময়? সবাই চুপ করে আছে বসে। কিন্তু সত্যবাদী সুকু আর তা পারে না। সে উঠল দাঁড়িয়ে—"আজ্ঞে, আমি জানি স্যার!"

"কি জান বাপু ?"

"শশী হেসেছে স্যার !"

"হুঁ, এদিকে এস ত' শশীনাথ। উঁহুঁ, অমন গজেন্দ্রগমনে কেন ? তারপর, কেন হেসেছিলে বল ত' বাপু ?"

গাঁট্টা খেয়ে শশী মাথায় হাত বুলোতে লাগ্‌ল, কিন্তু মুখে তার কথা নেই।

"হেসেছিলে কেন, গজ গজো শুনে জীবে গজার কথা মনে পড়ে গেল বুঝি ?"

তবু শশী নীরব ! অনন্ত পণ্ডিত ধমক দিয়ে বল্লেন এবার—"কেন হেসেছিলে ?"

"অমনি স্যার।"

"অমনি স্যার ! অমনি তোমার হাসি পায় ? কই, অমনি একবার কান্না পায় না ত' ! তার জন্যে গাঁট্টা লাগে কেন ? বল কেন হেসেছিলে ?"

শশী তবু কিছু বলবে না। হরিপদর হৃদ্‌কম্প এতক্ষণে বুঝি একটু থেমেছে।

হঠাৎ সত্যবাদী সুকু দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল আবার—"আমি বল্‌ব স্যার ?"

"কি বলবে স্যার ?" অনন্ত পণ্ডিত দাঁত খিঁচিয়ে উঠলেন। কিন্তু সুকু দমবার পাত্র নয়। সত্যের খাতিরে সোজা দাঁড়িয়ে

থেকে বল্লে, "হরিপদ ভূগোল খুলে বসে আছে ব'লে হেসেছে স্যার !"

"ভূগোল খুলে ?"

"হ্যাঁ স্যার, উপক্রমণিকা আনেনি ব'লে ভূগোল খুলে রেখেছে !"

সেদিন শশী আর হরিপদর লাঞ্ছনাটা যে কি রকম হ'ল তা আর ব'লে কাজ নেই, কিন্তু সুকু তার কি করবে ? সে ত' শুধু সত্য কথাই বলেছে !

শুধু স্কুলে নয়, বাড়ীতেও সুকুর সত্যবাদিতার জ্বালায় সবাই অস্থির। তার দিদি রাণু সেদিন বিকেল বেলা দরজার ধারে অবাক জলপান কিনছে, হঠাৎ সুকু এসে হাজির স্কুল থেকে। ব্যাপারটা লুকোন আর যাবে না। একটা আস্ত ঠোঙ্গা সুকুর হাতে দিয়ে দিদি তাই বল্লে মিনতি করে— "দোহাই সুকু, বলিস্‌নি ভাই, মাকে। তা হ'লে আর জলখাবারের পয়সা দেবে না কাল।"

সুকু গম্ভীর ভাবে বল্লে,—"ক' পয়সার কিনেছিস ?"

লজ্জিত হয়ে দিদি বল্‌লে,—"এই, মোটে তিন্‌ ঠোঙ্গা। তোকে একটা দিলাম, একটা আমি নেব, আর একটা দেব রাণীকে।"

রাণী পাশের বাড়ীর মেয়ে, রাণুর বন্ধু। সুকু নিজের

ঠোঙ্গাটি নিঃশেষ করতে করতে বল্লে,—"রাণীকে দিয়ে কি হবে ?"

"তা ত' বটেই ! শুধু নিজেরটি হলেই হ'ল, না ? স্বার্থপর কোথাকার !" রাণু চটে উঠতে গিয়েও সুকুর মুখের দিকে চেয়ে রাগটা চেপে গেল। সুবিধে হবে না সুকুকে ঘাঁটিয়ে। বাকী ঠোঙ্গাটা দু'জনের মধ্যে বখরা করাই ভাল।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে রাণু বল্লে,—"বল্‌বিনি ত' ভাই ?"

সত্যবাদী সুকু বল্লে,—"আমি ত' কথা দিইনি।"

অগত্যা রাণুকে সুকুর পরিপুষ্ট গালে একটা চপেটাঘাত করেই পরিণামের শাস্তির শোধ নিতে হয়।

সুকুর তারস্বরে কান্না বেতারকেও বোধ হয় ছাপিয়ে যায় কলকাতাময়, আর রাণুর সাজাটা যে নেহাৎ সোজা হয় না তা বলাই বাহুল্য।

সুকু সত্যাশ্রয়ী শুধু নয়, সত্যসন্ধানীও যে বটে তার প্রমাণ এতক্ষণে পাওয়া গেছে। ছুটীর দিনে দুপুর বেলা দিদি ভাঁড়ার ঘর থেকে আমচুর চুরি করে খায় কিনা এবং ক্লাশে কোন্ ছেলে জল খাবার নাম করে বাইরে বেরিয়ে আকাশে ঘুড়ির প্যাঁচ দেখে এ সমস্ত তথ্য সে সত্যের খাতিরেই পরমাগ্রহে সংগ্রহ করে। শুধু পরের বেলায় নয়, নিজের বেলাতেও তার সত্যানুসন্ধানের আগ্রহ প্রবল।

সেদিন ক্লাশের ছেলের হাতের লেখার সমালোচনা করায় সে স্বুকুর চেহারার স্বূক্ষ্ম সমালোচনা করে বলেছিল—"হোঁদল কুৎকুৎ।"

শব্দটা স্বুকুর মোটেই পছন্দ হয়নি। তবু তার প্রতি সেটা প্রয়োগ করা উচিত হয়েছে কিনা জানবার জন্যে সেদিন সন্ধ্যার পর ওপরের ঘরে বড় আয়নাটার সামনে স্বুকু অনেকক্ষণ ধরে নানাপ্রকার মুখভঙ্গী করে নিজেকে বিচার করে দেখছিল।

হোঁদল কুৎকুতের কি ফুলো ফুলো গাল হয়? নাকটা কি হয় থ্যাব্ড়া, চুলগুলো কি খোঁচা খোঁচা? হাস্‌লে কি তাকে এই রকম দেখায়, আর মুখ ভেঙ্গালে?

না, কিছুই ঠিক করা যায় না। অথচ ঠিক না করে আয়নার সামনে থেকে সে নড়তেও পারছে না।

এখন, এই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ ভারী অদ্ভুত এক কাণ্ড হয়ে গেল। এমন কাণ্ডের কথা বুঝি কেউ কখন শোনেনি।

নির্জ্জন ঘরে আয়নায় নিজের চেহারা দেখতে দেখতে হঠাৎ যেন স্বুকুর মাথাটা গেল গুলিয়ে। তারপর ভয়ানক একটা সন্দেহ তার ভেতর থেকে উঠ্‌ল ঠেলে। কিছুতেই সে ঠিক করতে পারে না, আয়নার কোন্ দিক্‌টায় সে আছে!

স্কুকু এদিক্-ওদিক্ নড়্ল-চড়্ল, কিন্তু ডান না বাঁ, আগে না পেছনে কিছুই সে বুঝতে পারছে না। ভড়কে গিয়ে সে এবার পিছু হাঁটতে স্বুরু করলে। একি! আয়নার ভেতরই সে যে ঢুকে যাচ্ছে, অনেক—অনেক পেছনে! ঘরের ভেতরকার স্কুকু যেন হাঁটতে হাঁটতে সেই ওপারের দেওয়ালে মিলিয়ে গেল!

এবার সে একা, চারিধারে ছমছমে অন্ধকার। রীতিমত তার ভয় করছে। ডান দিকে মনে হ'ল একটা আলো দেখা যাচ্ছে দূরে। মনে করলে সেই দিকে এগিয়ে একটু দেখবে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ডান দিক্‌টা গেল কোথায়? ডান দিকে যাবে বলে সে যে উল্টো দিকেই যেতে স্বুরু করেছে! ডাইনে যেতে হলে কি বাঁ দিকে এগুতে হবে নাকি?

খানিক বাদে তু'-চারবার ঘুরপাক খেয়ে হায়রাণ হয়ে তাকে ব্যাপারটা স্বীকার করতেই হ'ল। সব-কিছু সত্যিই গেছে উল্টে। কোন্‌টা ডান কোন্‌টা বাঁ ঠিক করে এখানে কিছু বলা যায় না। ডান কানটা চুল্‌কোচ্ছে মনে হ'লে বাঁ কানটায় হাত দিতে হয়, বাঁ পায়ে ঠোকর লাগলে ডান পা টনটনিয়ে ওঠে।

সম্প্রতি তার পায়ে সত্যিই ঠোকর লেগেছিল। কিন্তু কোন্ পায়ে লেগেছে সেটা ঠিক করবার আগেই কে হঠাৎ অন্ধকারে ধম্‌কে উঠ্‌ল,—"কে রে বাপু! দেখে চলতে পার না?"

সুকু ভয় পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বল্লে,—"অন্ধকার যে বড়! দেখতে পাইনি।"

অন্ধকারেই উত্তর হ'ল, "অন্ধকারেই দেখে চল না, আলোতে ত' তা হ'লে চোক বুজে চলবে?"

অবাক্ হয়ে সুকু বলে ফেল্লে,—"অন্ধকারে বুঝি দেখে চলা যায়?"

অন্ধকারে হঠাৎ হো হো করে একটা হাসির শব্দ শোনা গেল। তারপর কে বলে উঠ্‌ল,—"বদ্ধ পাগল! বদ্ধ পাগল!"

সুকু এবার একটু বিরক্ত হয়ে বল্লে,—"বদ্ধ পাগল কি রকম?"

"তা ছাড়া কি? তোমার কথাটা বিচার করলে কি দাঁড়ায়—ভেবে দেখেছ? অন্ধকারে বুঝি দেখে চলা যায়? তার মানে অন্ধকারে না দেখে চলা যায়। 'না'টা যদি কাটাকাটি করে নাও তা হ'লে দাঁড়ায় আলোতে দেখে চলা যায় না!"

সুকুর মাথাটা রীতিমত গুলিয়ে উঠেছে এবার। বল্লে—"এ সব কথার কিছু মানে হয় না।"

"খুব হয়। সব কথার মানে হয়। আলোর মানে হয়, দেখের মানে হয়—"

সুকু তাড়াতাড়ি তাকে থামিয়ে বল্লে, "এক সঙ্গে জড়িয়ে মানে হয় না।"

"এক সঙ্গে জড়ারে কেন ? দরজায় জানালায় কি এক সঙ্গে জড়ায় ! তক্তপোষে আর টেবিলে, জুতোয় আর জামায়··· অবশ্য বাঘে ছাগলে জড়ালে মানে হয় একটা।"

সুকু না জিজ্ঞাসা করে পারলে না—"কি মানে ?"

"কেন, ছাগলের মানেটা বাঘের পেটে হজম হয়ে শুধু মানে হয় বাঘ।"

না, এর সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। সুকু হতাশ হয়ে বল্লে—"তুমি কে ?"

"আমি ? দাঁড়াও ভেবে দেখি। আগে ছিলাম রামকান্ত, এখনো আছি রামকান্ত, কিন্তু আগে ছিলাম দাঁড়িয়ে, এখন আছি বসে ; আগে পেট ভরে খেয়েছিলাম, এখন পেয়েছে ক্ষিদে।"

"তাতে কি আসে যায় ?"

"বাঃ, তাতে আসে যায় না ! কি ছিলাম, কি হয়েছি, কি হবে, তার যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করে ত' আমি কি বলতে হবে ?"

"বলতে তোমার কতক্ষণ লাগবে ?"

"তা বলা যায় না। সাত বছরও লাগতে পারে, পৌনে তিন দিন সাড়ে তেরো সেকেণ্ডও লাগতে পারে।"

"সাড়ে তেরো সেকেণ্ড আবার কেন ?"

"বারো সেকেণ্ডে হবে না ব'লে।"

"তেরো সেকেণ্ডেও ত' হ'তে পারে।"

"হ'তে পারে কিন্তু হাতে রাখা ভাল।"

"তা তুমি হাতে রাখ, আমি ততক্ষণ তোমায় রামকান্ত ব'লে বল্‌ব।"

"কখ্‌খনো না, কিছুতেই না, আমায় কিছুতেই রামকান্ত বলতে পাবে না।"

"কেন, তোমার নাম ত' রামকান্ত-ই বল্লে!"

"বেশ করেছি বলেছি। নিজের নাম আমি যা খুসী বল্‌ব, তা ব'লে তুমি বলবার কে? তা ছাড়া আমার নাম রামকান্ত নয়।"

"সে কি, এই যে খানিক আগে বল্লে!"

"খানিক আগে বলেছিলাম তা এখন কি! এখন আমার নাম বদ্‌লে গেছে।"

"নাম আবার বদ্‌লে যায় নাকি?"

"খুব যায়, জামা বদ্‌লে যায়, কাপড় বদ্‌লে যায়, গোঁফ, দাড়ি, চেহারা, বদ্‌লে যায়। নাম বদ্‌লে যাবে না কেন? নাম ত' বদ্‌লাতেই হয়।"

"বেশ, তা হ'লে তোমায় কি নামে ডাক্‌ব?"

"আমায় ডাকতে তোমায় কে বলেছে?"

তাও ত' ঠিক। সুকু চুপ করে গেল, কিন্তু অন্ধকারে এমন করে দাঁড়িয়ে থাকা যায় কতক্ষণ? সুকু কি করবে ভাবছে এমন সময় আবার শোনা গেল—"চুপ করে আছ যে?"

"বাঃ, তুমি ত' ডাকতে বারণ করলে!"

"কথা কইতে ত' বারণ করিনি। না ডেকে বুঝি কথা হয় না? আমায় একটা কনুইএর গুঁতোও ত' দিতে পার।"

সুকু অবশ্য সেটা দিতে পারলে খুসীই হ'ত। সে উৎসুক ভাবে বল্লে—"দেখতে পাচ্ছি না যে!"

"আচ্ছা দাঁড়াও, অন্ধকারটা নিভিয়ে দিই।"

সুকু হেসে বল্লে,—"আলো জ্বালবে বল!"

"কেন তা বলব?"

"বাঃ, আলো নিভলেই ত অন্ধকার!"

"উঁহুঃ, অন্ধকার জ্বালালেই আলো নিভে যায়; তুমি পরীক্ষা করে দেখ।"

"আচ্ছা মুস্কিল ত' বাপু! আলো নিভোলে অন্ধকার হয় কে না জানে?"

"ও ভুল জানা। তোমার দু'পাশে কান আছে না দু' কানের মাঝে তুমি? কুকুরের পেছনে ল্যাজ না ল্যাজের আগে কুকুর?"

"আমার দু'পাশেই কান আছে।"

"তোমার কান দুটো টেনে দেখাচ্ছি, কানের মাঝখানে তুমি কি না!"

কান সম্বন্ধে কথাটা চাপা দেবার জন্যে সুকু তাড়াতাড়ি বল্লে, "ও ত' শুধু ঘুরিয়ে বলা। আসলে আলো নিভলেই অন্ধকার।"

"বেশ! তা হ'লে প্রমাণ কর অন্ধকার জ্বাললে আলো নেভে না।"

এ ত' মহা ফ্যাসাদ বাপু! এমন বিপদে কে আবার কবে পড়েছে! সুকু বল্লে, "আচ্ছা, তোমার কথাই ঠিক। অন্ধকারটাই নেভাও।"

"তাই বল তা হ'লে।"

আলো জ্বলে উঠতেই সুকু অবাক্ হয়ে দেখলে মস্ত বড় একটা ঘরের এক কোণে সে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরটা বোধ হয় পাঠশালা, ঘরের চারিধারে ছোট, বড়, মাঝারি, ঢ্যাঙা, বেঁটে, কুঁজো, রোগা, মোটা, দোহারা—এক গাদা ছেলেপুলে বসে কি বই পড়ছে! সবাই ছেলেপুলে নয়, তাদের ঠাকুরদাদারাও আছে।

তার সামনেই যে বেঁটে, এক মুখ শাদা দাড়ি-গোঁফওয়ালা বুড়ো বসেছিল তাকে দেখে অবাক্ হয়ে সুকু জিজ্ঞাসা করলে—"তুমিই কি রামকান্ত ?"

বুড়ো কট্‌মট্‌ করে তার দিকে তাকিয়ে ফিক্‌ করে হেসে ফেললে।

সুকু ভড়কে যেতেই সে লজ্জায় এক হাতে চোখ ঢেকে ফেলে আর এক হাতে পাশের ছেলেটাকে দেখিয়ে দিয়ে বল্লে,—"আমি নয়, ও রামকান্ত।"

সুকু তার দিকে চাইতেই সে আবার পাশের ছেলেটাকে দেখিয়ে দিলে—"ওই রামকান্ত।"

তারপর দেখতে দেখতে ঘরময় সবাই এ ওকে রামকান্ত ব'লে দেখাতে দেখাতে বুড়োর পালা ফিরে এল। সে কাঁদ কাঁদ হয়ে বল্লে, "বেশ! আমি রামকান্ত তা হয়েছে কি?"

"না না, হবে আবার কি! কিন্তু তোমরা কর্‌ছ কি?"

"দেখতে পাচ্ছ না, 'রামায়ণ' পড়ছি?"

সুকু বইটার ওপর ঝুঁকে পড়ে অবাক্‌ হয়ে বল্লে, "তোমার বইএ ত' শুধু একটা 'রা' লেখা! রামায়ণ পড়্‌ছ কোথায়?"

"বাঃ, আমাদের এটা 'সমবায়-পাঠশালা' তা জান না?"

"সে আবার কি?"

"আমরা পড়ার খাটুনি কমাবার জন্যে ভাগ করে বই পড়ি। আমি 'রা' পড়ি, রামকান্ত 'মা' পড়ে, তার পরের রামকান্ত 'য়' পড়ে, এমনি করে সবাই মিলে তাড়াতাড়ি সবটা পড়া হয়ে যায়।"

"নাঃ" স্বকু বল্লে,—"তোমার পাশে ওর নাম কি বল্লে ?"

"কেন ? রামকান্ত !"

"তার পাশে ?"

"সেও রামকান্ত !"

"তার পর ?"

"ওরা সবাই রামকান্ত।"

"দূর্, সকলের বুঝি এক নাম হয় ?"

"সকলের আলাদা নাম হতে পারে, এক নাম হবে না কেন ?"

"ও একটা যুক্তিই হ'ল না।"

"খুব হ'ল। তোমার নামও রামকান্ত।"

স্বকু এবার অত্যন্ত চটে উঠে বল্লে, "কখ্খনো নয়, আমার নাম স্বকু।"

"মিছে কথা ব'ল না, তোমার নাম রামকান্ত।"

স্বকু মুখ-চোখ রাঙিয়ে বল্লে—"আমি মিছে কথা বলি না, আমার নাম স্বকু !"

"তা হ'লে প্রমাণ কর তোমার নাম রামকান্ত নয়, ভ্যাবাকান্ত নয়, বেচারাম, ফ্যালারাম, তুলোরাম—কিচ্ছু নয়, শুধু স্বকু।"

"তা কেন প্রমাণ করতে যাব, আমি বলছি আমার নাম স্বকু।"

"তা বল্লে শুধু হবে কেন? সত্যি যদি হয় ত' প্রমাণ করতে হবে।"

"আমি যদি না করি?"

"না করলে তোমায় রামকান্ত হ'য়ে পড়তে হবে আমাদের সমবায়-পাঠশালায়।"

সুকু এবার ভয় পেয়ে গেল। ঢ্যাঙা, বেঁটে, ছোট, মাঝারি, ছেলে, বুড়ো, মোটা, রোগা, সমবায়-পাঠশালার রকমারি পড়ুয়া উঠেছে দাঁড়িয়ে। সে একটু একটু করে পেছোয় আর তারা এগোয়। মুখ ফিরিয়ে সুকু এবার চোঁচা মারলে দৌড়। রামকান্ত হ'তে তার একটুও ইচ্ছে নেই।

দৌড়োতে দৌড়োতে হঠাৎ ঠকাস্। মাথাটা সজোরে ঠুকে যেতেই সুকু চমকে উঠে দেখে সে আয়নার একেবারে ওপরে এসে পড়েছে। মাথাটা টনটনিয়ে উঠলেও সুকুর তখন আর দুঃখ নেই। সে আয়নার যে ধারে মানুষের থাকা উচিত সেই ধারেই পৌঁছে গেছে। আয়নার ওদিকে অন্ধকারে রামকান্ত'র দল হাজার শাসালেও আর তাকে ধরতে পারবে না।

কিন্তু তা ব'লে সুকুর ভয় গেছে ব'লে মনে ক'র না। সে এখন বুঝে-শুঝে সত্যি কথা বলে। রামকান্ত'র দল কোথায় ওৎ পেতে আছে কে জানে?

যে পাঁচটা ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা পৃথিবীকে জানি তাদের ত্রুটি অনেক। অনেক রকম ভুল তাদের হয়। তবু আমাদের মত সাধারণ মানুষের তাদের ওপর অগাধ বিশ্বাস। অগাধ বিশ্বাস আমাদের সাধারণ বুদ্ধির ওপর। এই ক'টা ইন্দ্রিয়ের নাগালের মধ্যে না এলেই—আমরা অনায়াসে অনেক কিছুকে উড়িয়ে দিই। বুদ্ধি দিয়ে আমরা কঠিনভাবে সত্য বা মিথ্যা ব'লে সব-কিছুর ওপর রায় দিই। কিন্তু এমন অনেক জিনিষ আছে যা সত্য মিথ্যার মাঝামাঝি

জগতের। যেখানে বুদ্ধি থই পায় না, ইন্দ্রিয় হার মেনে যায়।

সেই রকম একটা কাহিনীই আজ বলতে বসেছি।

গোড়ায় নিজের একটু পরিচয় দেওয়া ভাল। পশ্চিমের কোন একটি মাঝারি গোছের সমৃদ্ধ শহরে আমি ডাক্তারি করি। শহরের নামের কোন প্রয়োজন এ গল্পে নেই, সুতরাং নামটা নাই করলাম।

সেদিন রাত্রে শহরের প্রায় বাইরে বহুদূরের একটা 'কল' সেরে একলাই ফিরছিলাম। একে দারুণ শীত এবছর, তার ওপর রাত অনেক হওয়ায় ঠাণ্ডা অত্যন্ত বেশী পড়েছিল। পুরু পুরু গোটাকতক গরমের জামা থাকা সত্ত্বেও সব ভেদ করে মনে হচ্ছিল ঠাণ্ডা হাওয়া আমার পাঁজরার ভিতর গিয়ে ঢুকছে।

আসছিলাম আমার পুরোণ মোটরে। এ মোটর আমি আজ দশ বছর ধরে একাই চালিয়ে ফিরছি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছিল, সঙ্গে একজন সোফার থাকলেই বুঝি ভাল হ'ত। এই দারুণ শীতে ষ্টিয়ারিং হুইল ধরে সমস্ত হাওয়ার ঝাপ্‌টা সহ্য করার চেয়ে কষ্ট আর কিছু নেই।

আমাদের শহরটি অত্যন্ত ছড়ান। বড় বড় কয়েকটি রাস্তাকে আশ্রয় করে চারিধারে অনেকদূর পর্য্যন্ত সে বিস্তৃত হয়ে আছে। কিন্তু জমাট বাঁধেনি। অনেক সময় এক প্রান্ত

থেকে আর এক প্রান্তের মধ্যে শুধু একটি নির্জ্জন রাস্তা ছাড়া আর কোন যোগ নেই।

যে রাস্তা দিয়ে আসছিলাম সেটিও অত্যন্ত নির্জ্জন। দুধারে মাঝে মাঝে হরতুকি বা মহুয়া গাছ। আর রাস্তার দুধারে শুধু শূন্য সমতল মাঠ। তার ভেতর বাড়ি-ঘর নেই বল্লেই হয়। কে বাড়ি করবে এই নির্জ্জন যায়গায়!

অন্ধকারে অবশ্য এ সব কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। আমার মোটরের মিটমিটে আলোয় সামনের পথের খানিকটা দেখা যাচ্ছিল মাত্র। যেতে যেতে মনে হচ্ছিল, অন্ধকারের সমুদ্রই যেন আমার মোটরের আলোয় কেটে চলেছি কোনরকমে।

শীতের দরুণ কষ্ট পেলেও বেশ নিশ্চিন্ত মনেই চলেছিলাম। আমার 'কারটি' পুরাণ হলেও মজবুত। বেয়াড়াপণা সে করে না। আধঘণ্টার মধ্যেই বাড়ি পৌঁছে গরম লেপের মধ্যে আরাম করে যে শুতে পাব, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না।

অন্ধকার রাস্তার নিস্তব্ধতার ওপর শব্দের ঢেউ তুলে আমার মোটর চলেছে দ্রুত গতিতে। নিজেকে যথা সম্ভব আবৃত রেখে ভেতরে বসে সমস্ত চিন্তা পরিত্যাগ করে আমি শুধু আমার গরম বিছানাটার আরামের কথাই ভাবছি। ডাক্তারদের মত পরাধীন আর কেউ নয়। তবু মনে হচ্ছিল, একবার বাড়িতে

পৌঁছোতে পারলে প্রাণের দায়ে ছাড়া শুধু পয়সার জন্যে আর আমায় কেউ বার করতে পারবে না। এখন কোন রকমে কুড়ি পঁচিশ মিনিট কাটলেই হয়।

কিন্তু হঠাৎ অপ্রত্যাশিত এক ঘটনায় সুখস্বপ্ন ভেঙে গেল। আমার একান্ত সুস্থ সবল মোটর থেকে থেকে অদ্ভুত একরকম ধাতব আর্ত্তনাদ করতে সুরু করেছে। মোটরের এ রকম আচরণের কোন কারণই খুঁজে পেলাম না। আজ দুপুরেই আমার মোটরের ভালো রকম সেবা-শুশ্রূষা হয়ে গেছে। কোন রকম রোগের আভাষ তার ভেতর তখন ছিল না। হঠাৎ তার এ রকম আকস্মিক বিকারের কারণ তবে কি!

এই দারুণ শীতের রাত্রে অন্ধকার নির্জ্জন এই পথের মাঝে মোটরের এই বেয়াড়াপণায় সত্যিই ভীত হয়ে উঠলাম। এখনও প্রায় সাত আট মাইল পথ বাকী। রাস্তার মাঝে মোটর সত্যি অচল হয়ে গেলে করব কি? এই রাত্রের ডাকেও সঙ্গে লোক না আনার নির্বুদ্ধিতার জন্য এবার নিজের ওপরই রাগ হচ্ছিল। সঙ্গে একজন লোক থাকলে তবু বিপদে অনেক সাহায্য পাওয়া যেত।

দেখতে দেখতে মোটরের আর্ত্তনাদ আরো বেড়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে মোটরের বেগও মন্থর হয়ে আসছে বুঝতে পারলাম। মোটর চালনার সমস্ত বিদ্যা প্রয়োগ করেও সুরাহা কিছু

করতে পারলাম না। কাৎরাতে কাৎরাতে খানিক দূর গিয়ে আমার মোটর হঠাৎ রাস্তার মাঝে এক জায়গায় একেবারে থেমে গেল। আর তার নড়বার নাম নেই। চেষ্টার আমি তখনও ত্রুটি করলাম না। কিন্তু আমার পীড়নে অস্ফুটভাবে একটু কাতরোক্তি করে ওঠা ছাড়া আর কোন সাড়া সে দিলে না।

ভয়ে দুর্ভাবনায় সত্যিই তখন আমার সমস্ত দেহ আড়ষ্ট হয়ে এসেছে। মোটর ফেলে এই দারুণ শীতের মাঝে সাত

...ঁটে যাবার কথা ত কল্পনা করা যায়

দাহাই আপনার, চলুন ডাক্তার বাবু

...সারা রাত কাটানও অসম্ভব।

কোথায় নিজের বিপদ সামলা...

মাঝ রাত্রে যেতে হবে পরের চি...

মানুষ—জীবন-মরণের সমস্যা শুনলে

...যেন লাফিয়ে উঠল। এই

পারা যায় না। বাধ্য হয়েই তাই ব...

...লে ?

মাঠের ওপর দিয়ে সরু ...

...ডাক্তার বাবু !"

দেখাই যায় না। তাই ধ...

...রে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবার

...চেক হেঁটে একটি বা...

দে... ...থের ধারে ঝাঁকড়া একটি গাছের পাশে

ঘরের দরজা থে...

আবছ... শীর্ণ মূর্তি দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ এমন

লোকটা বল্লে:

জায়... ...রে সে উদয় হ'ল বুঝতে না পারলেও সাড়া

এখুনি আস...

দি... —"কে! কে তুমি ?" মনে তখন আমার একটু

...ন্ধকারে

আশার রেখাও দেখা দিয়েছে। তার আবির্ভাব যেমন বিস্ময়করই হোক না কেন, লোকটার কাছে সাহায্য পাবার সম্ভাবনা ত আছে।

লোকটা সেই জায়গা থেকেই বল্লে,—"আমায় চিনবেন না আপনি।"

চেনবার জন্যে আমি তখন ব্যস্ত নই। আমার সাহায্য করবার জন্যে একজন লোক তখন দরকার মাত্র। সেই কথাই আমি তাকে বলতে যাচ্ছি এমন সময় লোকটা আবার বল্লে,—"আপনাকে একটু আসতে ... ..র ভেতর তখন ছিল না। একজনের!" বিকারের কারণ তবে কি!

এমন সময়ে এ অনু... অন্ধকার নির্জ্জন এই পথের মাঝে হলামও তেমনি। ঠিক ..য় সত্যিই ভীত হয়ে উঠলাম। রুগী কি আমার জন্যে তৈরী ..াইল পথ বাকী। রাস্তার মাঝে

লোকটা আমার মনের ক..করব কি? এই রাত্রের ডাকেও ভগবানের দয়া ডাক্তার বাবু! এ জন্য এবার নিজের ওপরই পাব স্বপ্নেও ভাবিনি অথচ না পেলে ..কলে তবু বিপদে অনেক

বেশী কথাবার্ত্তা তখন আর ভাল ... .কটু বিরক্ত হয়েই বল্লাম—"কোথায় তোমার র..আরো বেড়ে

লোকটা এবার নিঃশব্দে অন্ধকারের বুঝতে পারলাদিকে হাত বাড়িয়ে নির্দ্দেশ করলে। সেদিকে চেয়ে ..োহা কিত্যি

দূরে একটা বাড়ির আলো যেন দেখা যাচ্ছে। এ রকম নির্জ্জন প্রান্তরের মাঝে এ রকম বাড়ি খুব কমই থাকে। হঠাৎ এ রকম জায়গায় এমন সময়ে যাওয়াও একটু বিপজ্জনক। তবে শত্রু আমার কেউ ত নেই এবং সঙ্গে টাকা-কড়িও নিতান্ত সামান্য এই যা ভরসা!

একটু ভেবে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"কি অসুখ?"

উত্তর এল—"জানি না ডাক্তার বাবু, কিন্তু অত্যন্ত সঙীন অবস্থা, তাড়াতাড়ি না গেলে বোধ হয় বাঁচান যাবে না। দোহাই আপনার, চলুন ডাক্তার বাবু!"

কোথায় নিজের বিপদ সামলাব, না হঠাৎ রাস্তার মাঝে মাঝ রাত্রে যেতে হবে পরের চিকিৎসায়। তবু ডাক্তার মানুষ—জীবন-মরণের সমস্যা শুনলে চুপ করে বসে থাকতে পারা যায় না। বাধ্য হয়েই তাই বল্লাম—'চল।'

মাঠের ওপর দিয়ে সরু একটু পথ। অন্ধকারে ভাল দেখাই যায় না। তাই ধরে লোকটার পিছু পিছু মিনিট পাঁচেক হেঁটে একটি বাড়ির উঠানে এসে দাঁড়ালাম। সামনে একটি ঘরের দরজা থেকে আলো দেখা যাচ্ছে। সেই দিকে দেখিয়ে লোকটা বল্লে,—"ওই ঘরেই রুগী বাবু, আপনি যান, আমি এখুনি আসছি।"

অন্ধকারের ভেতরই বুঝতে পারছিলাম, বাড়িটি বিশেষ

সমৃদ্ধ চেহারার নয়। গুটিচার-পাঁচেক ঘর এবং একটুখানি ঘেরা উঠান। ঘরগুলিও সব পাকা ছাদের নয়, দু' পাশে খোলার ছাউনি।

লোকটার কথা মত সামনের ঘরে এবার গিয়ে ঢুকলাম। ঘরটি আয়তনে বিশেষ বড় নয়, তার ওপর নানান আকারের বাক্স পেঁটরায় বোঝাই ব'লে ভেতরে নড়বার চড়বার স্থান অত্যন্ত অল্প। দরজার মুখোমুখি একটি জানালা। সেই জানলার ধারে মিট্‌মিট্‌ করে একটি কেরোসিনের লণ্ঠন জ্বলছে। সেই আলোতেই অস্পষ্টভাবে দেখা গেল, দরজার বাঁ-ধারে একটি চারপায়ায় অত্যন্ত শীর্ণ এক ভদ্রলোক শুয়ে আছেন।

আমি ঘরে ঢুকতেই ক্ষীণস্বরে তিনি বল্লেন,—"এসেছেন ডাক্তার বাবু! আপনার দয়া কখনও ভুলব না, বসুন।"

ঘরের ভিতর এদিক ওদিক চেয়ে বসবার জায়গা একটিই দেখতে পেলাম। জানালার কাছে চারপায়া থেকে অনেক দূরে একটি বেতের মোড়া। সেইটেই টেনে চারপায়ার কাছে আনবার উদ্যোগ করতে ভদ্রলোক আবার ক্ষীণস্বরে বল্লেন,— "বসুন বসুন, এইখানেই বসুন, আগে আমার রোগের কথা বলি শুনুন।"

একটু হেসে এবার সেইখানেই বসলাম। রুগীদের নানা

অদ্ভুত বাতিকের সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয় আছে। বুঝলাম, খানিকক্ষণ ধরে নিজের রোগ সম্বন্ধে ভদ্রলোকের নানা মতামত এখন আমায় শুনতে হবে। না শুনলে নিস্তার নেই।

ক্ষীণস্বরে প্রথমেই তিনি আরম্ভ করলেন,—"আমার রোগ সারাতে আপনি পারবেন না ডাক্তার বাবু? বাঁচাতে পারবেন ডাক্তার বাবু?" একটু হেসে বল্লাম, "সেই চেষ্টা করাই ত আমাদের কাজ! আর বাঁচবেন নাই বা কেন?"

একটু অদ্ভুত হাসির আওয়াজ এল খাট থেকে—"বাঁচতেও পারি ডাক্তার বাবু, কেমন?"

বল্লাম—"পারেন বই কি! কি তেমন আর হয়েছে আপনার?"

"না তেমন আর কি হয়েছে!" ভদ্রলোক আবার যেন হাসলেন, তারপর বল্লেন,—"ডাক্তারদের অনেক ক্ষমতা, কেমন না? কিন্তু ধরুন তাতেও যদি না বাঁচি, যদি আজ রাত্রেই মারা যাই?"

রোগীর এই অর্দ্ধোন্মত্ত প্রলাপের উত্তরে কি যে বলব কিছুই ভেবে পেলাম না। মনে মনে তখন এই বিলম্বে অস্থির হয়ে উঠছি।

রোগীই আবার বল্লেন,—"যদি আপনি থাকতে থাকতেই

মারা যাই ডাক্তার বাবু, কি হবে তাহ'লে? কে আপনার 'ফী' দেবে?"

আচ্ছা পাগল রোগীর পাল্লায় ত' পড়া গেছে! বল্লাম যদি নেহাৎই তাই হয়, তাহ'লে 'ফী' নাই পেলাম। আমরা শুধু 'ফী'র জন্যই সব সময়ে আসি না!

"তা বটে, তা বটে! পৃথিবীতে ভালো লোক, পৃথিবীতে মনুষ্যত্ব এখনও আছে, না ডাক্তার বাবু! কিন্তু আপনার 'ফী'র ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি ডাক্তার বাবু! হঠাৎ যদি মরে যাই ওই বাক্স খুলে ফেলবেন, বুঝেছেন ডাক্তার বাবু— ওই বেতের ছোট্ট বাক্সটি!"

ভদ্রলোকের স্বর আরো মৃদু হয়ে এল—"ওই বাক্স থেকে আপনার প্রাপ্য নেবেন। আরও একটা জিনিষ নেবেন ডাক্তার বাবু! বলুন, নেবেন ত?"

একটু বিরক্ত হয়ে বল্লাম—"কি?"

"কিছু না ডাক্তার বাবু, একটা কাগজ! কিন্তু ভয়ানক দরকারী কাগজ! এ কাগজ ওখানে আছে শুধু আপনি আর আমি জানি। আর কেউ জানে না। জানলে আর ওখানে ওটা থাকত না।"

ভদ্রলোক একটু চুপ করে থেকে একটু হেসে আবার বল্লেন,—"এ বাড়িতে কাউকে দেখতে না পেয়ে ভাববেন না

যেন আমার কেউ নেই। আমার অনেক আত্মীয় আছে—ওৎ পেতে আছে আমার মরার অপেক্ষায়। শুধু তাদের বিশ্বাস আজ আমি হয়ত মরব না, তাদের বিশ্বাস মরবার আগে আর আমি কিছু করব না। তারাই পাবে সব।”

আমি এবার বলতে যাচ্ছিলাম—“আপনার অসুখটা সম্বন্ধে—”

“হ্যাঁ, অসুখ ত দেখবেনই, তার আগে আর একটা কথা বলে নিই—ওই কাগজটি আমার উইল, ডাক্তার বাবু! আমার ছেলের নামে উইল। সে ছেলেকে আমি ত্যজ্যপুত্র করেছিলাম একদিন, কোথায় আছে তাও জানি না। কিন্তু জানেনই ত রক্ত জলের চেয়ে ঘন।”

আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করা যায় না। মোড়া থেকে উঠে পড়ে আমি বল্লাম—“এইবার আমি দেখতে পারি?”

খাট থেকে আওয়াজ হ’ল—“দেখুন!”

আমি খাটের কাছে এগিয়ে গিয়ে রোগীর নাড়ি দেখবার জন্যে হাতটা তুলে ধরলাম এবং পরমুহূর্ত্তেই সেই দারুণ শীতের ভেতরও আমার সমস্ত দেহ ঘেমে উঠল।

সে হাত বরফের মত ঠাণ্ডা! রোগী মৃত! শুধু মৃত হ’লে এতখানি আতঙ্কের, আমার বোধ হয়, কারণ থাকত না। কিন্তু ব্যাপার যে আলাদা! ডাক্তারি শাস্ত্রে যদি কিছু সত্য

থাকে, তাহ'লে এ রোগী এইমাত্র কখনই মারা যায়নি। তার মৃত্যু হয়েছে অনেক আগে, কয়েক ঘণ্টা আগে। সমস্ত দেহ তার কঠিন।

উন্মাদের মত আরো খানিকক্ষণ পরীক্ষা করলাম। না, ভুল আমার হতেই পারে না। কিন্তু তাহ'লে এ ব্যাপারের অর্থ কি?

তখন কিন্তু স্থিরভাবে কোন চিন্তা করবার আর আমার ক্ষমতা নেই। আতঙ্কে আমার বুকের স্পন্দন পর্য্যন্ত যেন থেমে আসছে। হঠাৎ জানালার কাছে বাতিটা দপ্ দপ্ করে নেচে উঠল। সেটা একবার নেড়ে দেখলাম তাতে তেল এক ফোঁটা নেই। প্রান্তরের মাঝে নিস্তব্ধ নির্জ্জন বাড়িতে এই ভয়ঙ্কর অবস্থায় আমি একা, এই বাতির আলোটুকুই যেন আমার একমাত্র সহায় ছিল। তাও নিভতে চলেছে দেখে, আমি দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। বুঝতে পারলাম পিছনে আলোটা আর কয়েকবার নেচে নিভে গেল। তখন আমি উঠান ছাড়িয়ে এসেছি প্রায়।

কি ভাবে তারপর অন্ধকার প্রান্তরের ভেতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে মোটরে উঠেছিলাম তা আমার মনে নেই। মোটর চালিয়ে শহরের মাঝ বরাবর আসবার পর আমার যেন স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরে এল। সব চেয়ে আশ্চর্য্য ব্যাপার

সে হাত বরফের মত ঠাণ্ডা ! রোগী মৃত !

মনে হ'ল, মোটরের এই চলা। খানিক আগে অদ্ভুতভাবে যে মোটর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল হঠাৎ এবার বিনা চেষ্টায় আপনা হ'তে সে মোটর এমন শুধরে গেল কি ক'রে ?

*　　*

তার পরদিন দিনের আলোকে লোক সঙ্গে করে নিয়ে সেই প্রান্তরের মাঝেকার বাড়ির নিঃসঙ্গ রোগীর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করার ব্যবস্থা করেছিলাম। তাঁর ছেলেই আজকাল সমস্ত বিষয়ের মালিক।

সেদিনকার রহস্যের স্বাভাবিক মীমাংসা আমি এখনও করতে পারিনি।

ভূপালের সঙ্গে সেদিন অনেকদিন বাদে হঠাৎ ট্রামে দেখা হয়ে গেল।

জরুরী কাজে টালিগঞ্জ যাচ্ছিলাম, হঠাৎ পেছন থেকে আমার নাম ধরে এক চীৎকার। চীৎকারের বদলে তাকে আর্ত্তনাদ বলাই বোধ হয় উচিত। মানুষ মানুষকে শুধু ডাকবার জন্যে অমন ভয়ানক আওয়াজ করে না।

কি হ'ল বুঝতে না পেরে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি ভীড়ের ভেতর ভূপাল। আমায় দেখতে পেয়েই গম্ভীর মুখে সে

এগিয়ে এল। বাইরে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে ব'লে ট্রামে বেশ ভীড়, দাঁড়াবার জায়গা নেই বল্লেই হয়। কিন্তু ভূপাল কারুর পা মাড়িয়ে কারুর কাপড়ে জুতোর কাদা লাগিয়ে সকলের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে ঝড়ের মত আমার কাছে এসে হাজির হ'ল। মনে হ'ল আমার কাছে আসার ওপর যেন তার জীবন-মরণের সমস্যা নির্ভর করছে। কিন্তু কাছে এসে সে শুধু বল্লে—"তুই!"

তার চীৎকারে ও এই সম্ভাষণে একটু অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। কিছু বলতে পারলাম না।

ভূপাল নিজেই আবার বল্লে—"ঈস্ কতদিন বাদে দেখা!"

এবার একটু সামলে আমি বল্লাম—"হ্যাঁ, অনেক দিন। এখন যাচ্ছিস্ কোথায়?"

"আমি? একটু বালীগঞ্জে যাব ভাই।"

"বালীগঞ্জ!"—অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

"হ্যাঁ, বালীগঞ্জ! কেন বালীগঞ্জে গেলে কি হয়!"

"কিছু হয় না, কিন্তু এ ত' টালিগঞ্জের ট্রাম!

ভূপাল এবার একটু অবজ্ঞার হাসি হাসল। আমার এতবড় ভুলের জন্যে যেন সে আমায় করুণা করছে।

তার ভাব দেখে একটু বিরক্ত হয়ে বল্লাম—"এটা যে টালীগঞ্জের ট্রাম তা দেখে ওঠনি?"

ভূপাল তবু বিজ্ঞের মত একটু হেসে বল্লে—"টালীগঞ্জ যেতে চাস্ ত' তাড়াতাড়ি নেমে যা।"

এর পর আর কি করে তাকে বোঝান যায়! আমার একার দ্বারা সম্ভবও হ'ত না যদি না সেই সময় পাশের কয়েকজন ভদ্রলোক ব'লে উঠতেন—"আরে মশাই এটা যে সত্যি টালিগঞ্জের ট্রাম!"

এবার ভূপালের একটু টনক নড়ল। একটু যেন সন্দিগ্ধ ভাবে সে বল্লে—"কিন্তু আমি যে দেখে উঠলাম।"

আমরা সবাই এবার বল্লাম—"কিন্তু আমরা এতগুলো লোক কি ভুল করেছি।"

ভূপাল এবার মাথা চুলকে বল্লে—"তাইত! বড় মুস্কিল হ'ল ত দেখি! এই বৃষ্টির ভেতর আবার নামতে হবে। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে যে বালিগঞ্জের ট্রাম পাব তাই বা কে জানে!"

তার অবস্থা দেখে এবার করুণা হচ্ছিল। বল্লাম—"তোর যেমন স্বভাব। একটু দেখে না ওঠার জন্যে এই কর্ম্মভোগ হ'ল ত!"

ভূপাল চুপ করে রইল।

কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ভোগ তাকে কোন রকম ভুগতে হ'ল না। রাসবিহারী এভেনিউএর মোড়ে তাকে বৃষ্টির ভেতর

নামতে হ'ত। হঠাৎ কেমন করে সেইখানেই ট্রামের কারেণ্ট গেল বন্ধ হয়ে। কারেণ্ট ফিরে আসার আগেই দেখা গেল সারের পর সার ট্রাম দাঁড়িয়ে গেছে। ভূপাল তার ভেতর না ভিজেই বালীগঞ্জের ট্রাম পেয়ে গেল।

ভূপালের সামান্য একটু পরিচয় আগেকার বর্ণনা থেকেই বোধ হয় পাওয়া গেছে। তার চরিত্রটি আর বেশী করে ব'লে বুঝিয়ে দিতে হবে না। তার মত আলগা, অগোছালো লোক ভূভারতে আর দুটি আছে ব'লে আমারও মনে হয় না। চেহারা দেখলে মনে হয় তার হাত-পাগুলো যেন ভাল করে জোড়া নেই। ফস্ করে কোন্‌দিন যাবে খুলে ব'লে ভয় হয়।

ভূপালের কীর্ত্তি অনেক। কত আর বলব। ভূপালের সঙ্গে অপরিচিত এক ভদ্রলোকের বাড়িতে দেখা করতে গেছি। বৈঠকখানার দরজা খুলে দিয়ে চাকর হয়ত ভেতরে খবর দিতে গেছে। ভূপাল অম্লান বদনে ঘরে ঢুকে একেবারে সুইচ বোর্ডের দিকে এগিয়ে গেল। সুইচ বোর্ডে অনেকগুলো সুইচ।

"করছ কি ভূপাল!"—জিজ্ঞাসা কর্‌লাম।

"দাঁড়াওনা, বড্ড গরম" ব'লে ভূপাল হঠাৎ একটা সুইচ

আন্দাজি টিপে দিয়ে চেয়ারে এসে বসে পড়ে চোখ বুজিয়ে বল্লে—"আঃ।"

চটে উঠে বল্লাম—"আঃ, কি হে?"

ভূপাল চোখ বুজেই বল্লে—"আঃ, বেশ ঠাণ্ডা!"

"ঠাণ্ডা কোথায়! চেয়ে দেখ দেখি একবার!"

ভূপাল এবার চোখ খুলে চাইল, তারপর একটু বিরক্ত হয়ে বল্লে—"ওঃ, আলোটা জ্বেলেছি বুঝি!"

"কিন্তু আঃ করছিলে কেন?"

এবার ভূপালের মুখে আর কথা নেই। কিন্তু তা ব'লে ভেবোনা সে ভয়ানক লজ্জিত হয়েছে। ভূপাল সে সবের ধার বড় ধারে না। ভুল করা-না-করায় তার কিছু যায় আসে না। সব সময়ে সে নির্ব্বিকার নিশ্চিন্ত।

তার নির্ব্বিকার নিশ্চিন্ত হবার কারণও আছে। কারণটা হচ্ছে তার কপাল। এরকম কপাল পৃথিবীতে কারও আছে ব'লে আমি ত জানি না। লটারিতে অনেকে লাখ লাখ টাকা পেতে পারে। খানায় পড়ে গিয়ে কারো কারো সোণার ঘড়ায় হাত কেটে যায়—কিন্তু ভূপালের তুলনায় তাদের ভাগ্য কিছু নয়। ভাগ্য তাদের একবারই কৃপা করে—ভূপালের বেলা ক্লান্তি বিরক্তি নাই। বালিগঞ্জের বদলে টালিগঞ্জের ট্রামে

চেপেও তাকে ভুগতে হয় না কোনদিন। তার কপালে উপযুক্ত সময়ে ট্রামের কারেণ্ট যায় বন্ধ হয়ে।

ভূপাল তাই বেপরোয়া ভাবে চলে। সে জানে ভাগ্য তার কাছে হার মেনেছে। সে যতই ভুল করুক তার ভাগ্য তাকে কোন রকমে বাঁচিয়ে দেবেই।

ভূপালের সঙ্গে তখন এক মেসে থাকি। রাত্তির বেলা খেয়ে-দেয়ে আঁচাতে গেছি, হঠাৎ ভূপাল চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "সর্ব্বনাশ হয়ে গেল ওই যাঃ!"

ঠুন করে একটা শব্দও আমরা শুনতে পেয়েছিলাম। ভূপালের ভাব দেখে মনে হ'ল অত্যন্ত দামী কিছু হারিয়েছে, জিজ্ঞাসা করলাম—"কি হ'ল হে! কি পড়ে গেল?"

ভূপাল কাতরভাবে বল্লে—"পকেটে একটা আনি ছিল ভাই!"

এবার আমরা হেসে উঠ্‌লাম—"একটা আনি হারাতেই সর্ব্বনাশ!"

কিন্তু ভূপাল তাতে চটে উঠল। "একটা আনি সামান্য কথা। চার-চারটে পয়সা। চারটে পয়সা চার হাত মাটি খুঁড়লে পাওয়া যায় না।" ইত্যাদি ব'লে আলো আনিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সে তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে তুললে। কি করি, বাধ্য হয়ে সবাই মিলে ভূপালের আনি খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু আনি পাওয়া গেল না।

দু'ঘণ্টা আনি খুঁজে হায়রাণ হয়ে ভূপালও শেষ পর্য্যন্ত হতাশ হয়ে শুতে গেল।

পরের দিন সকালে কলতলায় স্নান করছি এমন সময়ে চক্‌চকে কি একটা জিনিষ চৌবাচ্চার এক কোণে দেখতে পেলাম। তুলে দেখি না একটা চশমার কাঁচ। জিজ্ঞেস করতে যাব 'এটা কার কাঁচ', এমন সময় হাত থেকে ছোঁ মেরে কে কাঁচটা কেড়ে নিয়ে বল্লে—"আরে এই ত আমার চশমার কাঁচ।"

চেয়ে দেখি ভূপাল। জামা-জোড়া প'রে সে এক গ্লাস জল নিতে কলতলায় এসেছিল।

আশ্চর্য্য হয়ে বল্লাম—"তোমার কাঁচ কি রকম ?"

ভূপাল চোখ থেকে চশমাটা খুলে ফেল্লে, সত্যিই একদিকের কাঁচটা নেই। সেই জায়গার কাঁচটা লাগাবার চেষ্টা করতে করতে অম্লান বদনে বল্লে—"দেখছ না আমার কাঁচ !"

"তা ত' দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু সকাল থেকে ওই খালি চশমা চোখে দিয়ে তুমি কিছু টের পাওনি।"

"বুঝতে পারিনি ভাই !" ব'লে নির্ব্বিকারভাবে ভূপাল চলে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে বল্লাম—"তুমি না আনি হারিয়েছিলে ?"

"ওঃ আনি !" ভূপাল থমকে দাঁড়াল, তারপর এ পকেট

ও পকেট হাতড়ে হঠাৎ বল্লে—"আরে আনিটা ত পকেটেই রয়েছে। কাল কাঁচটা পড়ে গেছল।"

আমাদের গত রাত্রের হায়রাণির কথা স্মরণ করে তিক্তস্বরে বল্লাম—"পড়েই গেছল, গুঁড়ো কেন হয়নি তাই ভাবছি।"

কিন্তু কাকে বলা! "গুঁড়ো হবে কেন!" ব'লে নির্ব্বিকারভাবে ভূপাল বেরিয়ে গেল।

এই ভূপালের সঙ্গে এতদিন বাদে আমার দেখা। সেদিন ট্রামেই বুঝতে পেরেছিলাম ওই সামান্য আলাপে সে সন্তুষ্ট থাকবে না। আবার দেখা করতে আসবেই। ভূপালের বন্ধুবৎসলতাটা একটু বেশী।

কিন্তু ভূপাল যেদিন এল, সেদিন আমি বাঁধা-ছাঁদা করে প্রস্তুত হয়ে আছি। বিশেষ কাজে আমায় সেদিন দিল্লী যেতে হচ্ছে।

ভূপাল শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে বল্লে—"চ তোকে ট্রেণে তুলে দিয়ে আসি তাহ'লে।"

ভূপাল ট্রেণে তুলতে এসে সাহায্যের চেয়ে বিব্রতই বেশী করে তুলবে জানি। তবু তাকে বাধা দেওয়া ত আর যায় না।

সারা পথ ভূপাল বেশ ভালোভাবেই এল। প্ল্যাটফর্ম্ম-টিকিট কিনে আমায় ট্রেণের কামরা পর্য্যন্ত এগিয়েও দিলে

কোন রকম গোলমাল না করে। শুধু কোথায় হোঁচট খেয়ে জুতোর হিলটা তার খানিকটা গেছল উঠে। সেই

"আরে আনিটা ত পকেটেই রয়েছে। কাল কাঁচটাই পড়ে গেছল।"

জন্যে পেরেক-বেরুন তার জুতোয় ষ্টেশনের মোলায়েম প্ল্যাটফর্ম্ম বুঝি একটু ক্ষত-বিক্ষত হ'ল। আমার মনে হ'ল

ভূপাল সঙ্গে থাকার ফাঁড়া বুঝি কেটে গেছে। আমার আর ভয় নেই।

কিন্তু না,—হঠাৎ ভূপালের খেয়াল হ'ল সেও দিল্লী যাবে। ট্রেণের কামরায় বসে সে খানিক বাদে বল্লে—"বেশ লাগছে ভাই, চ তোর সঙ্গে দিল্লী যাই।"

কথা শুনে আমি ত' অবাক। দিল্লী যেন চুঁচড়ো, শ্রীরামপুর। গেলেই হ'ল।

"দিল্লী যাবি কি রে! কিছু ঠিকঠাক নেই।"

"তাতে কি? সেখানে বড় মামা আছেন, দিন কয়েক থেকেই আসি।" ব'লে ভূপাল উঠে পড়ল।

"উঠছিস্ কেন?" জিজ্ঞাসা করলাম হতভম্ব হয়ে।

"বাঃ, টিকিট করতে হবে না? তোর কাছে টাকা আছে ত?"

টাকা আমার কাছে ছিল, তবু ভূপালের এই আজগুবি খেয়ালে বাধা দেবার আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিছু লাভ হ'ল না। খানিক বাদে আমার কাছে টাকা নিয়ে সে দিল্লীর টিকিট কাটতে ছেঁড়া জুতোয় খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে গেল।

কি ভাগ্যি গাড়ি ছাড়বার আগেই ভূপাল এল ফিরে। মনকে ততক্ষণে আমি একরকম প্রবোধ দিয়েছি। হাজার হোক

জোড়াটা অল্পের ওপর দিয়েই কেটে গেছে। যাই হোক, দিল্লী পর্য্যন্ত ভূপালের সঙ্গ ত পাওয়া যাবে, আর তার যত দোষই থাক, সঙ্গী হিসাবে তার তুলনা হয় না।

কামরায় লোক নেই বেশী। দু'জনে বেশ আরাম করে বসে গল্প করতে করতে চল্লাম। বর্দ্ধমানে খুব স্ফূর্ত্তি করে দু'জনে খাওয়া গেল। আসানসোল পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নেই কাটল।

তারপর কামরায় টিকিট চেকার উঠল। আমার টিকিট প্রথমে দেখে তাতে সই করে চেকার ভূপালের টিকিট চাইলে।

ভূপালের পকেট হাতড়ানর ভঙ্গি দেখে গোড়ায় একটু ভয় পেয়েছিলাম, কিন্তু খানিক বাদেই সে টিকিট বার করে দিলে।

চেকার সে টিকিট হাতে নিয়ে এপিঠ ওপিঠ দেখে হঠাৎ বল্লে—"এ কি মশাই!"

ভূপাল গম্ভীরভাবে বল্লে—"কী আবার, দেখতে পাচ্ছেন না? টিকিট!"

"হ্যাঁ, টিকিট তা জানি, কিন্তু এ যে প্ল্যাটফর্ম্ম-টিকিট।"

"প্ল্যাটফর্ম্ম-টিকিট!" ভূপালের সঙ্গে আমিও আকাশ থেকে পড়ে ব'লে উঠলাম।

"দেখুন না" ব'লে চেকার টিকিটটা আমার হাতে দিলে। দেখে ত আমার চক্ষুস্থির। সত্যিই সেটা প্ল্যাটফর্ম্ম-টিকিট।

রেগে ভূপালকে এবার বল্লাম—"দিল্লীর টিকিট কোথায়?" দেখ কোন্ পকেটে রেখেছ।"

"পকেটে ত রাখিনি। সে ত ফেলে দিয়েছি।"

"ফেলে দিয়েছ?"

"হ্যাঁ, প্ল্যাটফর্ম্ম-টিকিট ভেবে আমি সেইটেই ফেলে দিলাম যে।"

এর পর আর কি মুখ দিয়ে কথা বেরোয়। ভূপাল তখন আমায় বোঝাতে চেষ্টা করছে যে দোষ তার তেমন কিছু নয়। বল্লে—"দুটো টিকিট থাকলে গোলমাল হবে ব'লে আমি প্ল্যাটফর্ম্ম-টিকিটটা আগে থাকতে ফেলে দিলাম।"

"বেশ করেছ।" ব'লে গুম্ হয়ে আমি তার দিকে পেছন ফিরে বসলাম।

কিন্তু পেছন ফিরে বসলে কি হবে। চেকার ত আর ছাড়বে না। বল্লে—"টিকিট যে একটা করতে হবে।"

ভূপাল বল্লে—"তাহ'লে দিল্লী গিয়ে আর কাজ নেই ভাই, আমি ধানবাদেই নেমে যাচ্ছি ছোড়দার কাছে। তুই ধানবাদের একটা টিকিট কিনে দে।"

তার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আমি পকেট থেকে ব্যাগ বার করলাম। চেকারের হাতে একটা নোট দিতে বল্লে—"চেঞ্জ ত নেই মশাই! আচ্ছা দাঁড়ান আমি আসছি। আপনি রাখুন নোটটা।"

চেকার চেঞ্জ আনবার জন্যে নেমে যেতেই আমি আবার পেছন ফিরে বসলাম। ভূপাল পেছন থেকে বল্লে—"দেখ আমার দোষ কি!"

"দোষ কি!" আমার এতক্ষণের চাপা রাগ এবার একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। তার অসাবধানতার জন্যে যা-নয়-তাই ব'লে ত ভৎর্সনা করলাম। বল্লাম, "তার কপাল গুণে এতদিন সে বেঁচে গেছে ব'লে চিরকালই এমনি ভাবে পার পাবে নাকি! মানুষ এত দেখেও কি সাবধান হয় না! এখন এ টিকিট কোথা থেকে আসবে? তার মত উজবুককে সঙ্গে নেওয়াও ঝকমারি?"

ভূপাল শুনতে শুনতে বুঝি অনুশোচনাতেই হঠাৎ উঠে পড়ল। তারপর দু'এক পা খুঁড়িয়ে হেঁটেই তার রাগ গিয়ে পড়ল ছেঁড়া জুতোটার ওপর। পা থেকে সে তুটো খুলে এক দিকে ছুঁড়ে দিয়ে সে নেমে যাবার উদ্যোগই করলে।

হঠাৎ আমি চমকে উঠলাম। ডাকলাম—"শোন ভূপাল।"

ভূপাল গম্ভীর মুখে ফিরে দাঁড়িয়ে বল্লে—"কি !"

"তোর জুতোর তলায় পেরেকে ওটা কি আট্‌কে ?"

"পেরেকে ? ব'লে ভূপাল হঠাৎ যেন ঝাঁপ দিয়ে পড়ল তার জুতোর ওপর। তারপর নিতান্ত স্বাভাবিক গলায় বল্লে—"এই ত টিকিট।"

সত্যি সেটা দিল্লীর টিকিট। ভূপাল ফেলে দেওয়া সত্ত্বেও সেটা কেমন করে তারই হিল-ওঠা জুতোর পেরেকে বিঁধে আট্‌কে ছিল এতক্ষণ। টিকিটটা একটু ময়লা হয়ে গেলেও দেখলাম অচল হয়নি।

এমন কপালের কথা বিশ্বাস করতে পারা যায় কি ?

সুনীল সেদিন বিলেত থেকে ডাক্তারী পাশ করে ফিরেছে। চিরকালই সে ডানপিটে, তার ওপর বিজ্ঞানের আলোয় পৃথিবীকে দেখবার পর ভয়-ডর তার আর কিছু থাকবার কথা নয়। তবু এখনো ব্রহ্মদৈত্যের মাঠের কথা শুনলে সে শিউরে ওঠে।

কেন যে ওঠে সেই গল্পই আজ তার কাছে যেমন শুনেছি বলব।

সুনীল বলে—

আমাদের শহরতলীর ভেতর দিয়ে যে লম্বা সিধে সড়কটা নদীর ধার পর্য্যন্ত গেছে তার দক্ষিণ পাশে ছিল ব্রহ্মদৈত্যের মাঠ। প্রকাণ্ড পতিত জমি; তাতে না ছিল মানুষের বসতি, না ছিল গাছ-পালা। শুধু শূন্য মাঠ খাঁ খাঁ করত।

এমন শূন্য মাঠ হয়ত অনেক জায়গাতেই আছে। কিন্তু এ মাঠের ভারী বদনাম ছিল। সে বদনামটা যে কি তা আমরা ভালো করে কেউ জানতাম না; তবু দিন-দুপুর বেলাতেও সে মাঠের পাশ দিয়ে যেতে আমাদের গা ছম্ ছম্ করত। নানা রকম কথাই সে মাঠ সম্বন্ধে শোনা যেত। কোন্‌টা যে সত্যি আমরা বুঝতে পারতাম না। কেউ বলত যে সে মাঠ নাকি কোন মানুষের পার হবার সাধ্যি নেই। সে দুঃসাহস করতে গিয়ে কত লোক নাকি আশ্চর্য্যভাবে মাঠের মাঝখানে দিনের আলোয় অদৃশ্য হয়ে গেছে। আবার কোথাও কোথাও শোনা যেত যে সে মাঠে গভীর রাতে লাল আলখাল্লা-পরা এক দীর্ঘদেহ বুড়ো লোক ঘুরে বেড়ায়, তার সঙ্গে চোখাচোখি হবার দুর্ভাগ্য যার হয় তার নাকি আর রক্ষা নেই। এমনি সব নানান গুজব শুনে এই মাঠ সম্বন্ধে আমাদের ভয়ের সীমা ছিল না। নদীর ধারে নবাবগঞ্জে আমাদের স্কুল; এবং সড়ক দিয়ে না গিয়ে এই মাঠ পার হয়ে গেলে অনেকটা সময়ের সুসারও হ'ত। কিন্তু অত্যন্ত

'লেট' হয়ে গেলেও মাষ্টারমশাইদের রক্তচক্ষু স্মরণ করেও আমরা সে মাঠ পার হয়ে যাবার সাহস সংগ্রহ করতে পারতাম না।

কিন্তু এই ভয়ঙ্কর মাঠই একদিন হঠাৎ আমাদের তীর্থস্থান হয়ে উঠল। একদিন সকালে উঠে হঠাৎ চমকে শুনলাম বাড়ির ধার দিয়ে ছ্যাকরা-গাড়িতে ব্যাণ্ড বাজিয়ে চলেছে। অনেক রকম বাজনাই পৃথিবীতে আছে কিন্তু ছেলেবেলায় দেখেছি, যে ছ্যাকরা-গাড়িতে সার্কাসের প্ল্যাকার্ড টাঙ্গান থাকে এবং যার ভেতর থেকে পৃথিবীর দাতাশ্রেষ্ঠ দাতা অমনি অমনি হ্যাণ্ডবিল বিলি করে যায়, তার ব্যাণ্ডের মত মধুর বাজনা আর কোন কিছুই বোধ হয় নেই।

অনেক কাকুতি মিনতি করে, ছ্যাকরা-গাড়ির পেছনে পেছনে বহুদূর পর্য্যন্ত দৌড়ে একটা হ্যাণ্ডবিল যোগাড় করে পড়ে জানলুম যে আমাদের শহরে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য্য 'বিশ্বম্ভর সার্কাস' আমেরিকায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাবার আগে অনুগ্রহ করে কয়েকদিনের জন্য খেলা দেখিয়ে যাবে।

প্রবেশ মূল্য সবচেয়ে কম—দেখলাম চার আনার এবং তারই সঙ্গে 'বিলম্বে হতাশ হইবেন' এই সতর্ক-বাণী পড়ে ঠিক করলাম, যেমন করেই হোক এ সার্কাস দেখতেই হবে।

কিন্তু পরের মুহূর্ত্তেই হ্যাণ্ডবিলের বাকীটা পড়ে মন একেবারে দমে গেল। দেখলাম সার্কাস হবে এই মাঠে। এই মাঠ! পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য্য দেখবার লোভেও এই মাঠে যেতে মন সরছিল না।

শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু লোভেরই জয় হ'ল। ভাবলাম শহরশুদ্ধ লোক ত যাবে, তবে ভয় কিসের।

বাড়িতে কাউকে অবশ্য জানালাম না। জানলে আর রক্ষা থাকত না। খেলা হবে দু'বার, সন্ধ্যায় আর রাত ৯টায়। কিন্তু নানান ফন্দি ফিকির করেও বাড়ির গুরুজনদের দৃষ্টি এড়িয়ে সন্ধ্যায় খেলায় যেতে পারলাম না। ৯টায় খেলা দেখতে যাওয়ার জন্যে বেশী সাহস দরকার কিন্তু সুবিধে অনেক। মনে মনে সেই সঙ্কল্পই করলাম। আমাদের শোবার ঘরটা একেবারে বাড়ির একধারে। কোন রকমে তাড়াতাড়ি পড়াশুনা সেরে সেদিন মাথা-ধরার নাম করে শুয়ে পড়লাম। এ ঘরে বড় দাদা ছাড়া আর কেউ শোন না। তিনিও অনেক রাত্রে এসে কোনদিকে না চেয়ে সটান শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। মাকে বল্লাম, মাথা-ধরার জন্যে চোখে আলো সহ্য হচ্ছে না। মাও সরল বিশ্বাসে আলোটা সরিয়ে নিয়ে গেলেন। আর আমায় পায় কে? মশারীটা ফেলে বেশ করে চারিধার গুঁজে দিয়ে জানালা দিয়ে একেবারে পথে।

এই মাঠের নামে যেটুকু ভয় ছিল সার্কাসের কাছে পৌঁছে, লোকের ভীড়, আলো ও আয়োজনের ঘটায় সে কোথায় যে উবে গেল তার পাত্তাই পেলাম না। এ যেন সে মাঠই নয়।
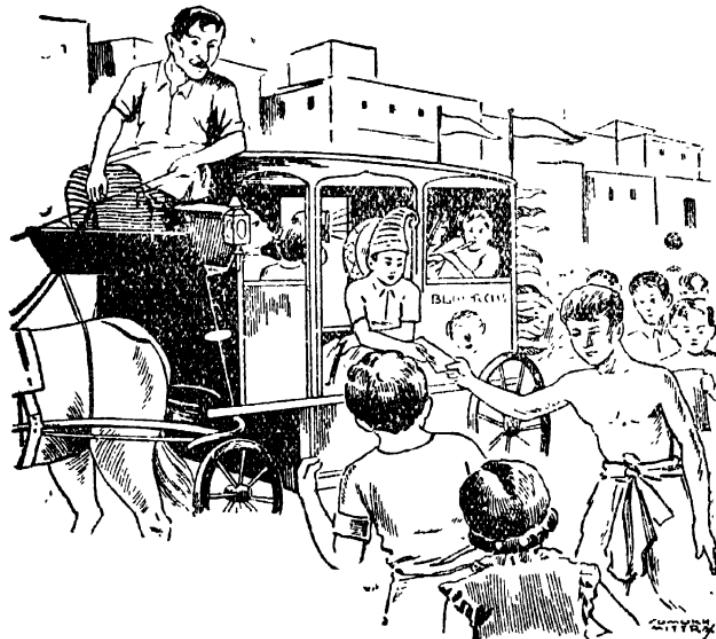
বাড়ির ধার দিয়ে ছ্যাকরা-গাড়িতে ব্যাণ্ড বাজিয়ে চলেছে।

রাতারাতি আলাদীনের প্রদীপ থেকে যেন তার ওপর এক মায়া নগর বানিয়ে দিয়েছে কে।

কি আশা-আকাঙ্ক্ষা কৌতূহল নিয়ে যে লম্বা গ্যালারির

সকলের চেয়ে উঁচু বেঞ্চির একধারে গিয়ে বসলাম তা বলতে পারি না। নিজের সৌভাগ্যে নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল সার্কাস আরম্ভ হবার আগে হয়ত কি একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাবে, সার্কাস দেখা আমার ভাগ্যে আর হবে না।

কিন্তু নির্ব্বিঘ্নে সার্কাস আরম্ভ হয়ে গেল।

বরাবর আমার সকাল সকাল শোয়া অভ্যাস। কিন্তু নতুন খেলার পর খেলা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দেখতে দেখতে ঘুম যে কোথায় উড়ে গিয়েছিল সেই দিন বলতে পারি না। ক্লাউনদের ভাঁড়ামিতে হাসতে হাসতে সেদিন নাড়ী ছিঁড়ে যাবার উপক্রম হ'ল। ট্রাপিজ খেলোয়াড়দের অসীম সাহস দেখে, তারা পড়ল মনে করে আমি যে সভয়ে কতবার চোখ বুজলুম তা বলতে পারি না।

সব খেলাই ভাল—শুধু ঘোড়ার একঘেয়ে খেলা একেবারে বিরক্তিকর। এক একবার ঘোড়ার খেলা আরম্ভ হয় আর বুঝতে পারি কি দারুণ ঘুমে চোখ আমার জড়িয়ে আসছে।

সার্কাস শেষ হতে তখন বোধ হয় বেশী দেরী নেই। সার্কাস-ম্যানেজার নিজে সেই একঘেয়ে ঘোড়ার খেলা সুরু করেছে। দেখতে দেখতে বিরক্তি ধরে গেছে। মনে মনে কখন তা শেষ হবে ভাবছি, এমন সময় মনে হ'ল ঘোড়াগুলি যেন রিংয়ের ভেতর নেই, গ্যালারিময় ছড়িয়ে পড়ে

তারা অত্যন্ত সহজে কাঠের ওপর দিয়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে। পরমুহূর্ত্তেই মনে হ'ল আমি রিংয়ের মাঝখানে কেমন করে এসে পড়েছি এবং আমায় ঘিরে বিদ্যুতের বেগে ঘোড়াগুলো ঘুরছে। শুধু ঘুরছে নয়, ঘুরতে ঘুরতে ক্রমশঃ তারা আমার একেবারে কাছ ঘেঁসে আসছে—আর একটু এলেই তারা একেবারে আমার গায়ের ওপর এসে পড়বে। আমি চীৎকার করে উঠলাম।······

সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙ্গে দেখি—অন্ধকার, চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার! সাতপুরু কালো পর্দ্দায় চোখ ঢেকে রাখলেও বোধ হয় চোখে এত অন্ধকার দেখা যায় না। আশে-পাশে হাত দিয়ে বুঝতে পারলাম আমি সেই গ্যালারির কাঠের বেঞ্চির ওপরই কাৎ হয়ে শুয়ে আছি অথচ আশে-পাশে কোথাও কেউ নেই।

যে সার্কাস আলোয়, মানুষের কোলাহলে জমজমাট হয়েছিল তার চিহ্নই কোথাও নেই। খালি অন্ধকার··· আর সেই অন্ধকারে ভিজে কাঠের গুঁড়োর কেমন একটা ভ্যাপ্‌সা গন্ধ!

বুঝলাম ঘোড়ার একঘেয়ে খেলা দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তারপর কখন সার্কাস ভেঙ্গে গেছে, কখন সমস্ত লোকজন চলে গেছে, কখন সার্কাসের লোকেরা সমস্ত

বাতি-টাতি নিভিয়ে চলে গেছে, কিছুই টের পাইনি। আশ্চর্য্যের কথা এই যে সার্কাসের লোকেরাও আলো নিভোবার আগে আমায় দেখতে পায়নি।

কিন্তু কেন যে পায়নি, সে কথা ভেবে এখন কোন লাভ নেই। বিরাট তাঁবুর ভেতর অন্ধকারে আমি একলা এইটেই সব চেয়ে বড় কথা। বাইরে বোধ হয় তখন ঝড় না হোক খুব জোরে হাওয়া বইছে। সমস্ত সামিয়ানাটা সে হাওয়ায় ফুলে উঠে এমন একটা অমানুষিক শব্দ হচ্ছিল যে আমার বুকের ভেতর পর্য্যন্ত শিউরে উঠ্‌তে লাগল।

মনে পড়ল, এই তাঁবুর বাইরে সেই ভীষণ মাঠ। এই নিশীথ রাত্রে সেখানে জনমানব নেই, শুধু অন্ধকার। কিন্তু তাঁবুর ভেতরেই বা কি করে থাকা যায়। আমি হাতড়ে হাতড়ে গ্যালারি দিয়ে নামলাম। কিন্তু কোন্ দিকে যাব? ধীরে ধীরে দু'পা এগুতেই হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে দেখলাম তাঁবুর একটা খুঁটির দড়িতে পা জড়িয়ে গেছে। অনেক কষ্টে সে দড়ি ছাড়িয়ে আর একটু যেতে গিয়ে আবার গোটাকতক চেয়ারে সজোরে ধাক্কা লাগল।

এবারে আর আমি থাকতে পারলাম না। সজোরে চীৎকার করে উঠলাম। সে চীৎকার শব্দ নিস্তব্ধ তাঁবুর ভেতর এমন অদ্ভুতভাবে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল যে, মনে হ'ল সে

আমার গলার শব্দ নয়। খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম —কেউ সাড়া দেয় কিনা দেখবার জন্যে—কিন্তু কোথায় কে ?

হঠাৎ সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল। মনে হ'ল, আমার অত্যন্ত নিকটে কারা যেন ফিস্ ফিস্ করে কথা কইছে। কাণ পেতে শোনবার চেষ্টা করলাম, কিছু বুঝতে পারলাম না। কাঁপা গলায় বল্লাম—কে ? কোন সাড়া শব্দ নেই। তেমনি ফিস্ ফিস্ শব্দ অত্যন্ত কাছে।

অত্যন্ত ভয়ের সময় মানুষের একটা সাহস কোথা থেকে আসে। মরিয়া হয়ে হাত বাড়ালাম। কিছুই নয়, দেখি একটা থামের গায়ে একটা কাগজ আঁটা ছিল ; তারই খানিকটা খুলে গেছে এবং সামান্য হাওয়ায় সেটা নড়ে খস্ খস্ শব্দ হচ্ছে। আমি এ শব্দটাকেই বোধ হয় ফিস্ ফিস্ কথা ব'লে মনে করেছিলাম। কাগজটা ছিঁড়ে ফেলে দিলাম। মনে একটু বলও পেলাম। মিথ্যে ভয় আর করব না—এ তাঁবু থেকে বেরুবার পথ বার করতেই হবে।

কিন্তু আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। কাগজটা ছিঁড়ে ফেলা সত্ত্বেও সেই ফিস্ ফিস্ শব্দ। এবার অপর দিকে। শুধু শব্দ নয়, তাড়াতাড়ি ফিরতে গিয়ে মনে হ'ল যেন আগুনের মত লাল দুটো চোখ এতক্ষণ জ্বলছিল, হঠাৎ মিলিয়ে গেল।

সমস্ত শরীর ভয়ে অবশ হয়ে যাচ্ছিল। প্রাণপণে চীৎকার করে বল্লাম—"তাঁবুতে কে আছ সাড়া দাও।" তবু সমস্ত নিস্তব্ধ!

এই নিশুতি রাত্রে অন্ধকার এই তাঁবুর ভিতর কি যে করব, কোথায় যে যাব, ভেবে না পেয়ে ভয়ে আমার শরীর হিম হয়ে যাচ্ছিল। গ্যালারির বেঞ্চি ধরে একবার বেরুবার পথ খোঁজবার চেষ্টা করলাম। ভাবলাম যেখানে বেঞ্চি শেষ হয়েছে, সেখানেই নিশ্চয় পথ পাওয়া যাবে। কিন্তু আশ্চর্য্য! বেঞ্চি ধরে ধরে যতদূর যাই কোথাও তা আর শেষ হতে চায় না। মনে হ'ল ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি এমনি ঘুরছি, তবু বেঞ্চির আর শেষ নেই।

ক্লান্তিতে পা আর চলতে চাইছিল না। হতাশ হয়ে অন্ধকারে বসে পড়লাম। তখন সত্যি ভয়ে-ভাবনায় আমি কেঁদে ফেলেছি। কিন্তু সেখানে কাঁদলে শুনছে কে? জেনে নিজেই চুপ করলাম। এবার মনে হ'ল কে যেন সার্কাসের ভেতর চলে বেড়াচ্ছে। স্পষ্ট পায়ের শব্দ—খট্ খট্ খট্!

ডাকলাম—কে?

পায়ের শব্দ সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল। কিন্তু খানিক বাদেই শুনলাম দূরে আবার সেই পায়ের শব্দ।

আবার ডাকলাম—কে? কোন উত্তর নেই, মনে হ'ল

একটা যদি আলো থাকত এ সময়ে। আমার মনে আলোর কথা উঠতে-না-উঠতেই আশ্চর্য্য হয়ে দেখি সার্কাসের মাঝখানে একটা আলো জ্বলে উঠ্ছে। সে আলোয় সমস্ত সার্কাস্ অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। শূন্য গ্যালারি, শূন্য সমস্ত চেয়ার, শুধু একলা আমি সার্কাসের এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি।

না, একলা ত আমি নই। আমার মুখোমুখি ওধারের গ্যালারীতে একটা লোক মাথা নীচু করে বসে আছে যে। আনন্দে বুকটা লাফিয়ে উঠ্ল। চীৎকার করে ডাকলাম—"শুনুন মশাই।"

লোকটা তবু মাথা তুলল না দেখে ভাবলাম হয়ত অন্যমনস্ক আছে ব'লে শুনতে পায়নি। ছুটতে ছুটতে তার কাছে গিয়ে ডাকলাম—"শুনুন।"

লোকটা এবার মুখ তুলে তাকাল। প্রথমে তার চাউনি অদ্ভুত মনে হ'ল। কিন্তু খানিক আমার দিকে চেয়ে থেকেই সে হো হো করে হেসে উঠে বল্লে, "অ্যাঁ, তুমি এসেছ, তোমার জন্যই ত বসেছিলাম।"

এ আবার কি বলে? হয়ত ভুল করেছে; ভেবে বল্লাম, "আমি সার্কাসের সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এখন বাড়ী যেতে পারছি না।"

লোকটা আবার হো হো করে বিকটভাবে হেসে উঠে

বল্লে—"বাড়ী যেতে পারছ না? বোসো, বাড়ী যাবে কি? কতদিন ধরে তোমায় খেলা দেখাবার জন্যে অপেক্ষা করে আছি, আমার খেলা দেখে যাও।"

তার চোখ দেখে সভয়ে দু'হাত পেছিয়ে এলাম, এ আবার কোন্ পাগলের পাল্লায় পড়া গেল। লোকটাও সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এল। বুঝলাম তার হাত ছাড়ান সহজে সম্ভব নয়।

ভয়ের ভেতরও বুদ্ধি করে এই পাগলকে ঠাণ্ডা করবার জন্যে বল্লাম, "তোমার খেলা ত এই খানিক আগেই দেখলাম। আমায় পথ দেখিয়ে দাও।"

লোকটা মাথা নেড়ে বল্লে—"উঁহু, আমার খেলা দেখনি। ওরা কি আর আমায় খেলা দেখাতে দেয়। দাঁড়াও, চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখ।"

তারপর আর বাক্যব্যয় না করে লোকটা একটা ঝোলান দড়ি বেয়ে সটান উপরে উঠে গেল। বহু উচ্চে সামিয়ানার মাথা থেকে একটা ট্রাপিজ ঝোলান ছিল। লোকটা দড়ি বেয়ে সেই ট্রাপিজে গিয়ে উঠলো। তারপর দেখি ভয়ঙ্কর দোলা। নীচের দিকে মাথা করে ট্রাপিজ দুলিয়ে একেবারে সার্কাসের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত লোকটা সবেগে দোল খেতে খেতে নানারকম কসরৎ দেখাতে লাগলো। এ লোকটা কি রকম পাগল বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

কিন্তু সে বেশিক্ষণ নয়। হঠাৎ এমন একটা কাণ্ড ঘটে গেল যা ভাবলে এখনও হৃদকম্প হয়। ট্রাপিজের দড়ি সহসা ছিঁড়ে গেল এবং সেই তাঁবুর মাথা থেকে লোকটা ছিট্‌কে গ্যালারির এক ধারে চীৎকার করে পড়ে গেল। আতঙ্কে চীৎকার করে আমিও সেইদিকে ছুটে গেলাম। মনে হ'ল গ্যালারির কাঠের উপর পড়ে লোকটার দেহ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে শেষ হয়ে গেছে।

কাছে গিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। লোকটা অক্ষত শরীরে সেই বেঞ্চির ওপবে বসে আছে। না, অক্ষত শরীর ঠিক তা নয়। তার মুখের দিকে চেয়ে ভয়ে আঁৎকে উঠলাম। তার মুখের নীচের দিকটা একেবারে সেই গলা থেকে ওপরের মাড়ি পর্য্যন্ত একেবারে ফাঁক। চিবুকবিহীন মুখে লোকটার দাঁতগুলো বিকটভাবে বেরিয়ে আছে। আমার ভয় দেখে লোকটা হাত বাড়িয়ে একটা কি কুড়িয়ে নিয়ে বল্লে—"নাও, এবার হয়েছে ত? ওটা আমার কেবল খসে যায়, সেই যে তিরিশ বছর আগে খসে গেছে এখনও জোড়া লাগল না।"

তার মুখ দেখি আবার জোড়া লেগে স্বাভাবিক হয়ে গেছে। কিন্তু স্বাভাবিক হোক, অস্বাভাবিক হোক, আর আমার দেখবার সাহস ছিল না। কোনো দিকে না চেয়ে আলো

থাকতে থাকতে প্রাণপণে ছুটে আমি সার্কাসের একটি দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়লাম।

কিন্তু বেরুলে কি হয়! সার্কাসে যদি বা আলো ছিল, এখানে দারুণ অন্ধকার! এই অন্ধকারে, এই মাঠ পেরিয়ে কোন্ দিক দিয়ে বাড়ি যাব ভেবে না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েছি, এমন সময় অত্যন্ত কাছে কার গলার আওয়াজ পেলাম—"কোথায় ছিলি এতক্ষণ হতভাগা? আমি অন্ধকারে সারা শহর খুঁজে বেড়াচ্ছি! চ, বাড়ী চ।"

ওমা, এ যে বড়দা'র গলা!

আমার পলায়ন জানাজানি হয়ে গেছে। হয়ত কেন, নিশ্চয়ই তার জন্মে যথেষ্ট বকুনি ও মার খেতে হবে। জেনেও কিন্তু তখন আনন্দে আমার গলা ধরে এসেছিল। শুধু বল্লাম—"চল দাদা।"

অন্ধকার পথে দাদা আগে আমি পিছে কতক্ষণ যে চলেছি বলতে পারি না। সামনে একটা উঁচু পুকুরের পাড়ে দাদাকে উঠতে দেখে বল্লাম—"দাদা, এ কোথায় এলে, এ পথ ত নয়!"

"হ্যাঁ, এই পথ।" থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। এ ত দাদার কণ্ঠস্বরও নয়। এবার অন্ধকারের ভেতরেও দেখতে পেলাম সামনে যে দাঁড়িয়ে, তার দীর্ঘ দেহ রাঙা একটা আলখাল্লায় ঢাকা; মাথায় তার লম্বা গোল টুপি। ধীরে ধীরে

সে আমার দিকে ফিরে দাঁড়াল কিন্তু তার সঙ্গে চোখাচোখি হবার আগেই আমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লাম।

সকালে চোখে আলো লেগে যখন জ্ঞান হ'ল, তখন দেখি একটা প্রকাণ্ড দীঘির উঁচু পাড়ের ওপর আমি শুয়ে আছি। অজ্ঞান অবস্থায় আর একটু হ'লেই গড়িয়ে একেবারে দীঘির অতল জলে তলিয়ে যেতে পারতাম। যাইনি, এই আশ্চর্য্য! এ দীঘি আমি চিনি। এই মাঠের একেবারে এক প্রান্তে, যেখানে সার্কাস্, তার প্রায় এক ক্রোশ দূরে এর অবস্থান। রাত্রে যা যা দেখেছি তা যদি স্বপ্ন হয়, তাহ'লে কেমন করে যে এতদূরে এসে পড়লাম বোঝা শক্ত! যখন বাড়ি ফিরলাম তখন বেলা ৯টা। আমার অবস্থা দেখে মা বল্লেন—"ভোরে উঠেই কোথায় গিয়েছিলি বল্ ত? সমস্ত গায়ে কাদা ধুলো, মুখ শুকনো!"

বুঝলাম আমার পালান মোটেই ধরা পড়েনি। কিন্তু মনে হ'লো পড়লেই ভালো ছিল।